ব্রিটিশদের দুই শ বছরের গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তির জন্য ভারতবর্ষে যুগপৎ যে আজাদি আন্দোলন অব্যাহত ছিল, এর অন্যতম পুরোধা ছিলেন উপমহাদেশের মুসলমানরা। বিশেষত আলেমসমাজ। বলা ভালো, আঠারো শতকের গোড়ার দিকে আলেমরাই প্রথম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। দেড় শতাব্দীকাল ভারতীয় আলেমসমাজ ও মুসলমানরা স্বপ্নের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন। পাড়ি দিয়েছিলেন রক্তের সমুদ্র।

কিন্তু বেদনাদায়ক সত্য হলো, আজ ইতিহাসের পাতায়, সভা ও মঞ্চে মুসলমানদের সেই ত্যাগের কথা অনুচ্চারিতই রয়ে যায়। কেবল তাই নয়, বরং বইপত্র-সিনেমায় মুসলমানদের দেখানো হচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে।

'ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান' বইটি সেই অমিয় সত্যকে ধারণ করেছে; যা দুই শ বছরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটেছে। তুলে ধরা হয়েছে আজাদি আন্দোলনের সেসব দিক। নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং এই ভূমিতে মুসলমানদের বিস্তৃত শেকড় অনুসন্ধানের জন্য বইটির পাঠ অপরিহার্য।

cover : eliyas bin mazhar / 01799030807

বাতায়ন
পাবলিকেশন

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান • সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি

বাতায়ন

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে
মুসলমানদের অবদান

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান

সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি
অনুবাদ : জুবায়ের রশীদ

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান

সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি

জুবায়ের রশীদ অনূদিত

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান

সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি

জুবায়ের রশীদ অনূদিত

প্রকাশক	:	বাতায়ন পাবলিকেশন
স্বত্ব	:	অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	:	ইলিয়াস বিন মাজহার
পরিবেশক	:	ইজরা পাবলিকেশন্স
বইমেলা পরিবেশক	:	আল-হামরা প্রকাশনী
অনলাইন পরিবেশক	:	রকমারি, ওয়াফিলাইফ
যোগাযোগ	:	০১৯৭৩৪০৬৩০৪

মূল্য : ২০০ টাকা

উৎসর্গ

ব্রিটিশবিরোধী আজাদি আন্দোলনে
আত্মদানকারী আলেমসমাজ ও মুসলিম সংগ্রামীদের
রফয়ে দারাজাত কামনায়

অনুবাদকের কৈফিয়ত

ব্রিটিশদের দুই শ বছরের গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তির জন্য ভারতবর্ষে যুগপৎ যে আজাদি আন্দোলন হয়েছে, এর অন্যতম পুরোধা ছিলেন উপমহাদেশের মুসলমানরা। বিশেষত আলেমসমাজ। বলা ভালো, আঠারো শতকের গোড়ার দিকে আলেমরাই প্রথম আজাদি আন্দোলনের সূচনা করেন। দেড় শতাব্দীকাল ভারতীয় আলেমসমাজ ও মুসলমানরা স্বপ্নের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি ধরেছেন। পাড়ি দিয়েছেন রক্তের নদী। ঝুলেছেন ফাঁসির কাষ্ঠে। হাসিমুখে বরণ করেছেন নির্বাসনের কান্না। আজাদি আন্দোলনের এমন একটি ক্ষেত্র ছিল না যেটিতে আলেমসমাজ ও মুসলমানরা নিষ্ঠাপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেননি।

বেদনাদায়ক সত্য হলো, আজ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজে দেশ মাতৃকার সেই অকুতোভয় বীর সন্তানদের নাম ও অবদানের স্বীকৃতি নেই। অত্যন্ত কূটকৌশল ও ঘৃণাদায়ক চতুরতায় মুক্তিকামী আলেমসমাজ ও মুসলমানদের ত্যাগ-তিতিক্ষার গৌরব মুছে ফেলা হচ্ছে। বছর ঘুরে আজাদির দিবস আসে, বড় বড় সভা-সেমিনার হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করা হয়, কিন্তু আলেমসমাজ ও মুসলমানদের কথা চেপে যান বক্তারা। আজাদির ইতিহাসের উজ্জ্বলতম একটি দিক অন্ধকার করে রাখা হয় নতুন প্রজন্মের কাছে। তাদের জানতে দেওয়া হয় না, ব্রিটিশ বিতাড়নে ভারতবর্ষের মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। পাঠ্যপুস্তকেও এর ইতিহাস লেখা হয়েছে বিকৃতভাবে। মোটকথা, আজাদির ইতিহাস থেকে আলেমসমাজ ও মুসলমানদের অবদান মুছে ফেলার সমস্ত নীলনকশা সম্পন্ন করে রেখেছে।

এহেন পরিস্থিতি অবলোকন করে মুফতি সালমান মানসুরপুরি আজাদি আন্দোলনে আলেমসমাজ ও মুসলমানদের অবদানের ইতিহাস লেখার তাগিদ অনুভব করেন। তিনি সর্বমান্য ও প্রথিতযশা একজন বিদগ্ধ আলেম। আজাদি আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ভারতের বিখ্যাত মাদানি পরিবারের সন্তান। গুরুত্বপূর্ণ এই ইতিহাস

নতুন প্রজন্মের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন তিনি; যেন সকলেরই বোধগম্য হয় এবং দীর্ঘতার কারণে পাঠে কোনো প্রকার বিরক্তি না আসে।

১৯৪৭ সনে ব্রিটিশদের করালগ্রাস থেকে ভারতবর্ষ আজাদ করার পর তৎকালীন গবেষক আলেম ও ইতিহাসবিদগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান শীর্ষক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন; আর মুসলমানদের মধ্যে বিশেষভাবে আলেমগণ যেহেতু এ যুদ্ধে স্মরণীয় ও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন, তাই পৃথকভাবে তাদের ইতিহাসও লেখা হয়েছে। তারপর দীর্ঘ একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে। স্বভাতই এ বিষয়ক লেখালিখি ও আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কৌশলে আজাদির ইতিহাস থেকে আলেমসমাজ ও মুসলমানদের বাদ দেওয়ার অবকাশ পেয়েছে।

উপর্যুক্ত চিত্র শুধু ভারতের নয়, বাংলাদেশেও ব্রিটিশবিরোধী আজাদি আন্দোলনের ইতিহাসে আলেমসমাজ ও মুসলমানদের স্মরণ করা হয় না। এ দেশের মানুষও ইতিহাসের এ অধ্যায়টি সম্পর্কে অন্ধকারে আছে। সাধারণ মুসলমানরা কেবল নয়, মাদরাসাপড়ুয়া তরুণ শ্রেণিও তাদের পূর্বপুরুষের সোনালি ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। অথচ তা জানা এবং নিজেদের মধ্যে সেই প্রেরণা পোষণ করা জরুরি। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় উরদু ভাষায় লেখা পুস্তিকাটি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে।

এখানে একটি কথা বলে রাখা সংগত মনে করছি; ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান বয়ানের পাশাপাশি ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরির প্রসঙ্গও এসেছে বইটিতে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অখণ্ড ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরি করা না করার পেছনে তৎকালীন আলেমদের মাঝে প্রগাঢ় একটি মতবিরোধ তৈরি হয়। একটি পক্ষ কোনোভাবেই চায়নি, ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরি হোক। দ্বিতীয় একটি পক্ষের জোরালো দাবি ছিল, ভারত ভেঙে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্র তৈরি করা। উভয়পক্ষে প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় আলেমগণ ছিলেন। সকলেরই শক্তিশালী যুক্তি ছিল। বর্তমান প্রেক্ষিতে দুটি পক্ষের মধ্যে কাদের অবস্থান সঠিক ছিল এ নিয়েও আছে তুমুল আলোচনা। ১৯৪৭ থেকে পক্ষ-বিপক্ষে এই আলাপ চলে আসছে এবং তা একটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। সেদিকে আমি যাচ্ছি না। এই প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য হলো, এ বইটিতে সম্মানিত লেখক একটি পক্ষ ধরে আলোচনা চালিয়েছেন। সেটি হলো, ভারত ভেঙে পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা। জন্মসূত্রেও তিনি

সেই কিংবদন্তি মনীষার উত্তরসূরি, যিনি আজাদি আন্দোলনের সিপাহসালার ছিলেন এবং সাত চল্লিশের উত্তাল সময়ে অখণ্ড ভারতের পক্ষে আওয়াজ তুলেছিলেন। ফলে ভারত ভেঙে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের ইস্যুতে তিনি একপাক্ষিক কলম চালিয়েছেন।

আমি বাংলাদেশের একজন তালিবুল ইলম হিসেবে এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের কোনো পক্ষ-বিপক্ষ নিরূপণে যাচ্ছি না। আমি আমার জ্ঞান-গবেষণায় উপলব্ধি করেছি, উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনা। এক পক্ষ অনুভব করেছেন, মুসলমানদের জন্য অখণ্ড ভারতই কল্যাণকর হবে। অপর পক্ষ অনুভব করেছেন, পৃথক রাষ্ট্র তৈরিই হবে এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর। স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তির নিরিখে তারা তখন অবস্থান নিয়েছেন। আমি তাদের হৃদয়ের আর্তি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামীতার শিক্ষাটুকু এই ঐতিহাসিক মতপার্থক্য থেকে সবক হিসেবে নিলাম। পাঠকদেরও তাই অনুরোধ করব। আমরা শায়খুল হিন্দ ও মাদানিকে যেমন হৃদয়ে ধারণ করি, তেমনই ভালোবাসি থানবি ও উসমানিদের। আমরা এই মহান সিলসিলারই লিগ্যাসি বহন করছি।

আশা করছি, সংক্ষিপ্ত এই গ্রন্থটি পাঠের পর নতুন প্রজন্মের সামনে ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে। নিকট অতীতে সংঘটিত আজাদি আন্দোলনের অচর্চিত ও অজানা একটি দিক রোদের মতো ছড়িয়ে পড়বে তাদের চিন্তার উঠোনে।

—জুবায়ের রশীদ
jubairroshid195@gmail.com

প্রকাশকের কথা

ভারত উপমহাদেশ এক সমৃদ্ধ জনপদের কথা বলে। উন্নতি-পরিপাটি আর সচ্ছলতার কথা বলে। রূপ-সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটায়। আর এতেই লোলুপ দৃষ্টি পড়ে আদর্শ-বিবর্জিত পশ্চিমা জাতির। হামলে পড়ে ভারত উপমহাদেশে।

ব্যবসায় ব্যবসায় অর্জন করে নেয় বিশাল পুঁজি। তবুও যেন ওদের লোভের সমাপ্তি নেই। লোভের বশবর্তী হয়ে ভারত উপমহাদেশকেই নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে নেয়। শুরু করে লুণ্ঠন।

শুরু হয় আন্দোলন-সংগ্রাম। ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানরা। আহমদ শহিদ রহ. থেকে শুরু করে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. পর্যন্ত চলমান থাকে আন্দোলন-সংগ্রামের সে ধারা। এরমধ্যে ঘটে যায় বালাকোটের যুদ্ধ, সিপাহি বিদ্রোহ, রেশমি রুমাল আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক ঘটনা।

এভাবে একদিন ভারত স্বাধীন হয়। আর মানুষও ভুলে যেতে শুরু করে সেসব মানুষের ত্যাগের কথা, বীরত্বের কথা। ভুলে যায় তাদের অবদানকে। তাদের সেই অবদান পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

প্রকাশক
বাতায়ন পাবলিকেশ

লেখকের কথা

'অপাঙক্তেয় ভেবে যে প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছ
সে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখো, আলোর বন্যায় ভেসে যাবে।'

১৫ আগস্ট ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্তানের আজাদি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছে। এই সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দিল্লিতে জাতীয় মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, বাজার-মার্কেট ও পথ-ঘাট সর্বত্র অনিন্দ্য বাতিসজ্জায় আলোকিত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের পুরো দিনটি জাতীয় সংগীত, গানবাদ্য আর উদোম নাচে পালিত হয়েছে। এই যে রাষ্ট্রজুড়ে অসম্ভব হাসি-আনন্দের বিপুল প্রকাশ, এদের অধিকাংশই হচ্ছে তারা, যারা স্বাধীনতাকে ফুলের আকৃতিতে পেয়েছে। তাদের না আছে পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের অনুভূতি, আর না তারা অবগত আছে রক্ত ও লাশে ভরা সেই ট্রাজেডি সম্পর্কে। ব্রিটিশ অপশক্তিকে বিতাড়িত করে অর্জিত স্বাধীনতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কতটুকু পূরণ হয়েছে কি আদৌ হয়নি–সে ব্যাপারেও নেই তাদের সামান্য চিন্তা। এ তো শুধু এক ধরনের প্রথাগত উৎসব, যা তাদের অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদাসীন করে দিয়েছে। অথচ পূর্বোক্ত জাতিসমূহের অতীত ইতিহাস, ট্রাজেডি, বৃত্তান্ত ও উপাখ্যান আমাদের এই শিক্ষা দেয়, যে জাতি নিজেদের অতীত ভুলে যায়, পেছনে ফেলে আসা দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারা ভবিষ্যতে সফলতার চূড়া স্পর্শ করতে পারে না। সাফল্যের জন্য আগামীর বিজয়ের রূপরেখা তৈরি করতে হয় অতীতকে সামনে রেখে। আর যখন অতীতকে ভুলে যাবে, সঠিক ইতিহাস মুছে ফেলবে, প্রকৃত সত্যের ওপর পর্দা ফেলে দেবে তখন সেই জাতির ভাগ্যাকাশে চারিত্রিক অধঃপতনই অবধারিত হয়ে যায়।

আজাদির পর হিন্দুস্তানের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে যে নিকৃষ্টতর আচরণ করা হয়েছে, রাষ্ট্র থেকে তাদের পৃথক করে দেওয়ার ধারাবাহিক যে হীন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং আজ অবধি চলছে, তা এ জাতির নৈতিক অধঃপতনেরই একটি দৃষ্টান্ত। অকৃতজ্ঞতার কুৎসিত উদাহরণ এরচেয়ে আর কী হতে পারে যে,

স্বাধীনতার মূল ক্ষেত্র যারা তৈরি করেছে, মৃতপ্রায় নাগরিকদের হৃদয়ে যারা আজাদির প্রাণ সঞ্চার করেছে, অখণ্ড জাতিকে দাসত্বের জিঞ্জির ভেঙে মুক্তির স্বপ্ন যারা দেখিয়েছে, সকলের আগে যারা মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আত্মগোপনের বদলে যারা নিজেদের জীবন মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়েছে, বুক পেতে যারা রাউন্ড রাউন্ড গুলি বরণ করেছে, হাসিমুখে গলায় পরেছে ফাঁসির রজ্জু, স্বদেশের জন্য পৃথিবীতে আত্মত্যাগের অতুলনীয় উপমা স্থাপন করেছে, বুকের রক্ত ঢেলে যারা সোনার অক্ষরে নিজেদের নাম খোদাই করে নিয়েছে, আজ তাদেরকে স্বাধীনতার ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ, তাদের গলায় পরানো হচ্ছে নেতৃত্বের মাল্য। তাদের নামে দেওয়া হচ্ছে জয়োধ্বনি।

আজাদির পঞ্চাশ বছরে দেশের প্রজন্মে পরিবর্তন এসেছে। তখন যারা প্রবীণ ছিল তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। নতুন প্রজন্ম দেশের নেতৃত্ব হাতে নিয়েছে। এই নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালন হয়েছে সে সমস্ত বিদ্যালয়ে, যেখানে খ্রিষ্টানদের প্রবর্তিত সিলেবাসে পাঠদান দেওয়া হয়েছে। সেসব গ্রন্থে আজাদি আন্দোলন ও ইতিহাসের যে পাঠ দেওয়া হয়েছে, বর্তমান প্রজন্ম তাই জেনেছে। ইতিহাস-সংক্রান্ত তাদের এই হচ্ছে জ্ঞান। বিগত পঞ্চাশ বছরে তারা যাদের নাম শুনে আসছে, তাদেরকেই আজাদি আন্দোলনের অগ্রনায়ক ও রথি-মহারথি জ্ঞান করছে। নির্দিষ্ট এই কিছু নাম ব্যতীত তারা না আর কিছু জানে এবং না তাদের জানার কোনো আগ্রহ আছে।

অন্যদের নিয়ে আমাদের কোনো আফসোস নেই, হা-হুতাশ নেই, আর না তাদের দোষারোপ করার কোনো সুযোগ আমাদের আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্বয়ং আমাদের পূর্বসূরিদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন? আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে আমাদের বন্ধন কতটা সুদৃঢ়? শেকড়ের সাথে আমাদের যোগসূত্র কতটা আন্তরিক?

এটি যারপরনাই ভাবনার বিষয়। আজ মুসলমানদের বিদ্যালয়গুলোতে আজাদির নামে যে সকল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোতেও কেবল সেসব ইতিহাস ও তারিখ আওড়ানো হয়, যেগুলো বিগত পঞ্চাশ বছরে সংকলন করা হয়েছে। অথচ দরকার ছিল, উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া এবং পরিপূর্ণ আস্থার সাথে এ

কথার জানান দেওয়া যে, মাতৃভূমির প্রতিটি বালিকণায় আমাদের ঠিক ততটুকুই অধিকার রয়েছে, যতটুকু রয়েছে হিন্দুস্তানের অন্য জাতি-গোষ্ঠীর। বরং আরেকটু আগে বেড়ে ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ সামনে রেখে এই কথা বলা যে, ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমরা যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত করেছি, অন্য জাতি-গোষ্ঠী সকলে মিলে এর সমপরিমাণ ঘামও প্রবাহিত করেনি।

আজ আমি আমাদের নতুন প্রজন্মকে কয়েকটি কথা বলতে চাই–

এক. স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম একশ বছর রণাঙ্গনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন কেবল আলেমসমাজ। এরপর অন্যরা সম্মুখপানে এগিয়ে আসে। সূচনা থেকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত ভারতবর্ষের আলেমসমাজ অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন।

দুই. ব্রিটিশদের আধিপত্য ও ক্ষমতায়ন নস্যাৎ করে ধর্মীয় ভাবমর্যাদার সংরক্ষণ ছিল আলেমসমাজের প্রধান টার্গেট।

তিন. আলেমসমাজের মুক্তি-সংগ্রাম কেবল হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাদের চিন্তায় বিস্তৃত ছিল পুরো এশিয়া। কারণ, হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা লাভের ওপর এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নির্ভরশীল ছিল। সেইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এ কথাও অবহিত করছি যে, কী এমন কারণ ছিল, যার কারণে নিভৃত প্রাণ আলেমসমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন? আলেসমাজ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার পর রাষ্ট্র ও অপরাপর মুসলমানদের ওপর কী প্রভাব পড়েছে? আলেমসমাজ ইসলাম ও ইসলামের নিদর্শনাবলি সংরক্ষণের জন্য যে সকল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছেন, সেগুলোতে সাধারণ মুসলিমসমাজ কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাদের কতটুকু দায়িত্ব পালনের দরকার ছিল? আমাদের প্রকৃত গন্তব্য কোথায় আর আমরা যাচ্ছি কোন দিকে?

এই জরুরি বিষয়গুলো স্বজাতীর লোকদের অবগতির জন্য নিদায়ে শাহি পত্রিকায় আজাদি আন্দোলনে আলেমসমাজের ভূমিকা শীর্ষক শিরোনামে ১৯৯৭ সেপ্টেম্বর থেকে ধারাবাহিক লিখতে শুরু করি। ১৯৯৮-এর আগস্টে মোট বারোটি পর্বে তা সমাপ্ত হয়।

আনন্দের বিষয় হচ্ছে, আগ্রহী পাঠকগণ সাদরে প্রতিটি পর্ব গ্রহণ করেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে সবগুলো পর্ব একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়; যেন যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত এক মলাটে চলে আসে এবং এ ব্যাপারে যারা অজ্ঞ, তারা সঠিক ইতিহাস জানতে পারে।

আশা করি, পূর্বসূরি বুজুর্গ মনীষাদের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ জাতির সামনে ফুটিয়ে তোলার বরকতে মহান আল্লাহর দরবারে আমি অধমের এই খেদমত কবুল ও বরিত হবে–ইনশাআল্লাহ।

–সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি
মাদরাসা শাহি মুরাদাবাদ, ভারত
১০ রজব ১৪২১ হিজরি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলন-সংগ্রাম
স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিভিন্ন অঞ্চলে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর অনুসারীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

আহমদ শহিদ রহ.-এর শাহাদাত-পরবর্তী অবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়
আজাদি আন্দোলন (সিপাহি বিপ্লব) ১৮৫৭
আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

চতুর্থ অধ্যায়
১৮৫৭-এর আজাদি আন্দোলনে দেওবন্দিদের অংশগ্রহণ
১৮৫৭-এর আজাদি সংগ্রামে দেওবন্দিদের অংশগ্রহণ

পঞ্চম অধ্যায়

তাহরিকে শায়খুল হিন্দ রহ.

রেশমি রুমাল আন্দোলন

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় স্রোতে উলামায়ে কেরাম

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হিন্দুস্তানের
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জমিয়তে উলামার আত্মপ্রকাশ

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষণিকের ভুল শতাব্দীর কান্না

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

অষ্টম অধ্যায়

গৃহ পুড়ে গেল গৃহেরই প্রদীপে

ভারত ভাগের ঘোষণা

প্রথম অধ্যায়

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলন-সংগ্রাম

[১৮১৮-১৮৩১]

- আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনা
- শাহ আবদুল আজিজ রহ.-এর জিহাদের ফাতওয়া
- সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর সংগ্রাম
- শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই
- বালাকোট ট্রাজেডি এবং শাহাদাতের ঘটনা

স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার কথা

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কো দ্য গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজ নাবিকরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে পা রাখে। উপকূলীয় অঞ্চল কালিকটে তাদের ব্যবসার সূচনা করে। অতঃপর বাণিজ্যের নাম করে কূটকৌশলে ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। সেসব অঞ্চলে স্থাপন করে একের পর এক কুঠি। এ সময় স্থানীয় কেউ বাধা দিতে এলে পর্তুগিজরা তাদের শক্তহাতে নিদারুণ নির্মমভাবে প্রতিহত করে। সেই সাথে তারা ভারত মহাসাগরে চালাতে থাকে লুটপাট। তাদের দস্যুপনার কারণে সাগরে চলাচল একপর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। সাথে তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকার জনগণকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। খ্রিষ্টরাজ্যসমূহের মতো এ দেশেও পাদরিদের দিয়ে পৃথক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে বিচারের নামে তাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হতো। এভাবে পর্তুগিজরা ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রভাব ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

শুরুতে কেবল পর্তুগিজরা এলেও পরবর্তী সময় ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলোও ভারতবর্ষের সম্পদ ও খনিজ দ্রব্যাদির লোভে একের পর এক আগমন করতে থাকে। এরই ধারবাহিকতায় ইংল্যান্ডের একশ এক জন বণিক সংঘবদ্ধ হয়ে তিন হাজার পাউন্ড পুঁজি নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া নামে একটি বহুজাতিক কোম্পানির নাম করে ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে তাদের প্রথম পণ্যবাহী জাহাজ নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।[১] সেই থেকে শুরু হয় ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের ধারা। আধিপত্য বিস্তারের মানসে অত্যন্ত কৌশলে ব্যবসার পাশাপাশি তারা ক্রমান্বয়ে সৈন্য-সামন্ত এনে এখানে সামরিক ঘাঁটিও শক্ত করতে থাকে। একপর্যায়ে চাতুর্য ও কৌশল খাটিয়ে মোঘল রাজদরবারেও পৌঁছে যায় তারা। নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভারতে তাদের আগমন—এ কথা বুঝিয়ে মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গির থেকে ব্যবসায়িক লাইসেন্স ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। কিন্তু মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগিরের মৃত্যু অর্থাৎ, ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোঘল সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল বিধায় ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী এ দেশে তেমন সুবিধা লাভ এবং কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

১. নকশে হায়াত : ১৭৩

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোঘলদের শাসন তুলনামূলক দুর্বল হয়ে পড়ে, দিল্লির কর্তৃত্বের খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যায় এবং দিকে দিকে প্রদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক রাজত্ব শুরু হয়, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের গোপন এজেন্ডা ও ব্যবসার ছুতোয় ভারতবর্ষে তাদের আগমনের মিশন বাস্তবায়ন শুরু করে। আর এর প্রথম শিকার হন বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা–পলাশির আম্রকাননে নিজ বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এর ফলে বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার বিরাট অঞ্চলে ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাজুড়ে জুলুম-নিপীড়ন ও ত্রাসের যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং সর্বত্র যেভাবে লুটপাট চালায়, তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হয়ে আছে। সেই থেকে ব্রিটিশ ক্ষমতা ও রাজত্ব ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ দেশের অধিকাংশ শাসক ও নবাব ইংরেজদের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে সকলে ইংরেজের অধীন হয়ে যায়। বাকি থাকেন মাত্র একজন। তিনি সুলতান টিপু শহিদ রহ.। একদিন তিনিও ১৭৯৯-এর এক যুদ্ধে এই প্রেরণাদায়ক বাণী বলতে বলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন–'শেয়ালের মতো হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বেঁচে থাকা গৌরবের।'[১]

আমৃত্যু তিনি ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ইতিহাসের এই সাহসী সুলতানের নিথর, রক্তাক্ত দেহ দেখে ইংরেজ সেনাপতি লর্ডস বলেছিল, 'আজ থেকে ভারতবর্ষ আমাদের।'

তখনও দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইংরেজরা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। নামে মাত্র হলেও মোঘলদের কুরসি ও শাসন দিল্লিতে অধিষ্ঠিত আছে। এ ছাড়া হিন্দুস্তানের সব অঞ্চল তাদের পদানত হয়ে যায়। কিছু অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের শাসন চলছিল। কিছু অঞ্চলের শাসনকর্তা ইংরেজদের সাথে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে কার্যত বশ্যতা স্বীকার করে শাসন পরিচালনা করছিল; ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বত্র ইংরেজদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছিল পূর্ণমাত্রায়।

মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছিল দিল্লিতে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়। মোঘল সেনাবাহিনীর অবস্থা তখন একেবারেই নড়বড়ে। প্রতিরোধ করবে দূরের কথা, ইংরেজ শক্তির সামনে তারা দাঁড়াতেই পারেনি। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দিল্লিতে প্রবেশ করে। অক্ষম ও অপারগ মোঘল বাদশাহ শাহ আলম থেকে জোরপূর্বক তারা এ অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নেয় যে, 'সৃষ্টি খোদার, রাজত্ব বাদশার এবং শাসন চলবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির।'[২]

১. নকশে হায়াত : ১/১৭০; সিরাতে সুলতান টিপু শহিদ : ৩৪৩
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/৭৮

উক্ত অঙ্গীকারনামা ছিল ইংরেজদের এ কথার বহিঃপ্রকাশ যে, আজ থেকে হিন্দুস্তানে ইসলামি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ভারতবর্ষ এখন ব্রিটিশ শাসনের কর্তৃত্বাধীন। এর ফলে ন্যায় ও ইনসাফ, সত্য ও সততা, আমানত ও দিয়ানত এখানে সুদূর কল্পনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মনুষ্যত্ব ও মানবতা এখানে অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলছে। যেন আকাশে-বাতাসে এ আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত সত্য ও সুন্দরের কবর রচিত হয়ে আজ ভারতবর্ষ প্রবেশ করছে জুলুম-নিপীড়ন-একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলে।

সেই থেকে পুরোদমে ইংরেজরা তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। জনগণকে বাধ্য করে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে। তাদের শাসন ও কর্তৃত্বে যারা বাগড়া দেয়, তাদের ওপর চালায় অত্যাচার-নিপীড়নের স্টিমরোলার। অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের বাসিন্দাদের ওপর ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতনের কথা বহুদূর পর্যন্ত শোনা যেতে থাকে। এসবের ফলে সবার অন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও দ্রোহ ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি ও আপন জান-মালের নিরাপত্তার ভয়ে কেউ ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস করতে পারছিল না। ব্রিটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী ও তার দোসরদের ভয়ে সকল নাগরিক মুখে তালা লাগিয়ে বসে রইল।

এই ছিল যখন গোটা ভারতবর্ষের অবস্থা, তখন দিল্লির নিভৃত কোণ থেকে এক নির্জনবাসী বৃদ্ধ আলেম তার দূরদর্শী দৃষ্টি দ্বারা ভারতবর্ষের আগামী দিনের করুণ অবস্থা এবং এর শেষ পরিণতি কেমন ভয়াবহ হতে পারে, তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি এই দূরদর্শী দৃষ্টি লাভ করেছেন তার সম্মানিত পিতা হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ.-এর উত্তরাধিকার সূত্রে। মনীষা পিতার তালিম-তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষায় তিনি 'পুত্র তার পিতারই মশালবাহী হয়' কথার উত্তম দৃষ্টান্ত ও সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেন।

ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষের ত্রাতা হয়ে এগিয়ে আসা এই মহানায়ক আর কেউ নন, এই দরবেশ কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন, তিনি হচ্ছেন সেই কিংবদন্তি, যাকে সমগ্র দুনিয়া আজ মুসনাদুল হিন্দ শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহমতুল্লাহি আলাইহি নামে চেনে। দিল্লিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠালাভের পর তিনি একটি বিস্তারিত ফাতওয়া প্রকাশ করে হিন্দুস্তানকে দারুল হারব তথা যুদ্ধকবলিত রাষ্ট্র বলে ঘোষণা জারি করেন। এমন কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে জীবনের তোয়াক্কা না করে, ইংরেজদের দমন-পীড়নে শঙ্কিত না হয়ে তিনি এই সাহসী ফাতওয়া জারি করেন। তার এই ফাতওয়া ছিল ভারতবর্ষের আজাদি আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি। এর মাধ্যমে তিনি স্বজাতির হৃদয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের জ্বলন্ত প্রেরণা ও বীজ বপন করে দেন। মূলত এরপর থেকেই ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা ও পথচলা শুরু হয়।

ঐতিহাসিক ফাতওয়ার ভাষ্য

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ.-এর মূল ফাতওয়াটি ছিল ফারসি ভাষায় লেখা। পরবর্তী সময় তার ফাতওয়ার যে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, এর সতেরোতম পৃষ্ঠায় ফাতওয়াটি রয়েছে। সেটির হুবহু নিম্নে তুলে ধরছি–

> এ দেশে মুসলিম শাসকের কোনো কর্তৃত্ব নেই। খ্রিষ্টান অফিসার ও আমলাদের আদেশ-নিষেধ কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই কার্যকর হয়ে থাকে। কুফরি শাসন জারি হওয়ার অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রের সকল ব্যবস্থাপনা, প্রজাদের অধিকার, খিরাজ, উশর, বাণিজ্যিক কর, খাজনা, চোর-ডাকাত থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা, বিচারব্যবস্থা ও অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কাফের হচ্ছে সর্বোচ্চ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। যদিও তারা জুমা, দুই ঈদ ও গরু কুরবানি করতে কোনো প্রকার বাধা দিচ্ছে না। এতৎসত্ত্বেও যে বিষয়টি উপর্যুক্ত সকল বিষয়ের মূল নীতিমালা (কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর), তা এখানে নিঃসন্দেহে অর্থহীন ও পদদলিত অবস্থায় রয়েছে। এজন্যই নিঃসংকোচে আমাদের মসজিদগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। সর্বসাধারণকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে কোনো নাগরিক তাদের অনুমতি ও নিরাপত্তা গ্রহণ ছাড়া এ শহরে প্রবেশ করতে পারছে না। মুসাফির বা বণিকদের নগরে যাতায়াতের যে অনুমতি দেওয়া আছে, সেটিও দেশীয় স্বার্থ কিংবা নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুরই অনুমতি দিচ্ছে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ।

জনসাধারণে ফাতওয়ার প্রভাব

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ. ফাতওয়া প্রদানের পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছেন সেটি হচ্ছে, মহারাজা জগুনাথ ও নবাব আমির খান যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন, তখন তিনি তার খাস মুরিদ ও অনুগত শিষ্য সাইয়েদ আহমদ শহিদ বেরলবি রহ.-কে নবাব আমির খানের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ দেন।[১]

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. প্রায় সাত বছর নবাব আমির খানের নেতৃত্বাধীন সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। পরবর্তী সময় যখন নবাবের মাঝে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের আগ্রহ পরিলক্ষিত হলো, তখন ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যান।[২]

নতুন এক আন্দোলনের সূচনা

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আন্দোলনের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে এবং শাহ ইসমাইল শহিদ রহ. ও মাওলানা

১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/৮৬
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/৮৮

আবদুল হাই রহ.-এর মতো বরিত ও সম্মানিত আলেমদের পরামর্শে একটি দল গঠন করেন, যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে সর্বসাধারণের ইসলাহ তথ ব্যক্তিপর্যায়ে আত্মিক সংশোধন করবেন এবং তাদের অন্তরে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের বীজ বপন করবেন।[১] কেননা, আত্মিক পরিশুদ্ধি ব্যতীত সর্বসাধারণের অন্তরে জিহাদের জজবা তৈরি করা অসম্ভব। তাই প্রথমে অপরিহার্য ছিল, সর্বসাধারণকে কুফর, শিরক, বেদআতসহ সকল প্রকার অন্যায় ও অনৈতিক কাজের অন্ধকার থেকে বের করে সহিহ আকিদা-বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ চেতনায় বলীয়ান করে তাদের ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি করা। তাহলে দ্বীনের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর আত্মত্যাগ স্বীকার করতে সক্ষম হবে। সকল প্রকার বিপদ-মসিবত পাড়ি দিতে সহজে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

আহমদ শহিদ রহ.-কে নেতা মনোনীত করার কারণ

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর বয়স যদিও কম ছিল, কিন্তু তার মাঝে এমন অনেক বৈশিষ্ট্যের সমাহার ছিল, যা তার চেয়ে বয়সে বড় ও প্রবীণ ব্যক্তির মাঝেও ছিল না। তিনি রুহানি কামালাত তথা আধ্যাত্মিকতায় বেশ পূর্ণ ছিলেন। স্বয়ং শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ. তার আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শ দিতেন, তারা যেন সাইয়েদ আহমদ শহিদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রাখে এবং তার দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে জীবনযাপন করে। তার সেই আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও বরকতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে সাধারণ ও বিশেষ-নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ সঠিক পথের দীক্ষা পেয়েছেন। দুনিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন, ক্লেদাক্ত জীবন ছেড়ে আলোকময় জীবনে পদার্পণ করেছেন এবং তার ওপর অটল-অবিচল থেকেছেন। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হচ্ছে, সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. দীর্ঘ সাত বছর নবাব আমির খানের বাহিনীতে থেকে যুদ্ধ-সংগ্রামের যে প্র্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা দ্বিতীয় কারও মাঝে ছিল না।[২]

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর নেতৃত্বে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চাশ জনের একটি বাহিনী দিল্লি থেকে যাত্রা করে। এই আন্দোলনের অগ্রপুরুষ শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ. বাহিনী যাত্রার প্রাক্কালে তার টুপি ও জামা শরীর থেকে খুলে প্রিয় শিষ্য সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-কে পরিয়ে দেন এবং সকলের জন্য রহমতের দোয়া করেন।[৩]

১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/৮৯
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/৯১
৩. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/৯৩

দিল্লি থেকে এই বাহিনী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তি ও সমাজের ইসলাহ। এর মৌলিক কারণ ছিল দুটি–

এক. ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যতীত জিহাদি আন্দোলন সফলতা লাভ করতে পারবে না।

দুই. একেবারে সূচনাতেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তৎকালীন বাস্তবতার আলোকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল না।[১]

বাহিনী দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমান্বয়ে গাজিয়াবাদ, মুরাদনগর, মারাঠা, মুজাফফরনগর, দেওবন্দ ও সাহারানপুর গমন করে। অতঃপর সেখান থেকে দিল্লি প্রত্যাবর্তনের সময় গড়, আলিগড়, মুরাদাবাদ, শাহজাহানপুর হয়ে রায়বেরলভিতে অবস্থিত খানকা 'তাকিয়া শাহ আলামুল্লাহ'য় কয়েক মাস অবস্থান করেন। অতঃপর ইলাহাবাদ, কানপুর, বেনারস, সুলতানপুর গমন করেন। তিন মাস লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করেন; যা তৎকালে (ভারত ও নেপাল মিলে গঠিত) আওদা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

যেসব অঞ্চলে তারা গমন করেছেন, সেখান থেকে কুফর, শিরক, বেদআত, ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি বিদায় নিয়েছে। সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর মজলিস, ওয়াজ নসিহত ও তার মুখলিস সঙ্গীদের হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত কথামালা জনসাধারণের ওপর এ পরিমাণ প্রভাব ফেলে যে, দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন, জাহেলি রুসম-রেওয়াজে মত্ত এমন হাজারো মানুষ সত্য ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে তওবা করে ফিরে আসে। তাদের অব্যাহত দাওয়াতের ফলে মুসলিম কমিউনিটিতে এমন বিস্ময়কর দ্বীনি জাগরণ তৈরি হয়, যার দৃষ্টান্ত ছিল নিকট সময়ে বিরল।

এ সময় ইসলাহ ও আত্মিক সংশোধনের পাশাপাশি জনসাধারণকে জিহাদের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করা হয়। শুধু উদ্বুদ্ধ করেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তারা যেন অন্তরে জিহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য তিনি লড়াইয়ের বিভিন্ন হাতিয়ার প্রস্তুত করতে থাকেন। একবার সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. তার এক ভক্তকে একটি বন্দুক দিয়ে বললেন, 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নিয়তে হাতিয়ার প্রস্তুত করো। পেট ভরে খাবার খাও এবং অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নাও। এর চেয়ে উত্তম কোনো দরবেশি আর নেই।'[২]

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর অন্যান্য কার্যক্রম

ব্যক্তি গঠন ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচির পর সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. নবতর পদ্ধতিতে আরও একটি ইসলাহি (সংশোধনমূলক) কর্মসূচি গ্রহণ

১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/৯৩
২. সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ : ১/২৩৬

করেন। সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর ব্যক্তি গঠন, সমাজ সংশোধন তথা যাবতীয় কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল জিহাদ। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন। তবে কৌশল হিসেবে তিনি নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলোর বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। এবারের কর্মসূচি ছিল এমনই। তৎকালীন আলেমগণ পথের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও অনিরাপদ হওয়ার অজুহাতে ভারতবাসীর জন্য জিহাদ ফরজ নয় বলে ফাতওয়া প্রচার করেন। লোকদের মাঝে এর প্রভাব এতটাই জোরেশোরে পড়ে যে, তারা হজে যাওয়া সম্পূর্ণই ছেড়ে দিলো। এজন্য সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ব্যক্তি গঠন ও সমাজ সংশোধনের পাশাপাশি হজের প্রসঙ্গটিও সামনে নিয়ে আসা জরুরি মনে করলেন। উদ্দেশ্য, জনসাধারণের হৃদয়ে যেন হজপালনের বাসনা জাগ্রত হয়।[১]

হজযাত্রায় তিনি নিজ এলাকা বেরলবি থেকে ইলাহাবাদ, মির্জাপুর, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা গমন করেন। দুই মাস কলকাতায় অবস্থান করেন। শুধু কলকাতায় অবস্থানকালীন ষাট হাজার মানুষ তার হাতে বাইয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। গড়ে প্রতিদিন প্রায় একহাজার মানুষ বাইয়াত গ্রহণ করেন।[২]

বেরলবি থেকে যখন প্রথম যাত্রা শুরু করেন তখন সফরসঙ্গী ছিল চার শ। কলকাতায় যাওয়ার পর এ সংখ্যা বেড়ে আট শয় পৌঁছে। ভাড়াকৃত এগারোটি জলযান দিয়ে তারা সাগরপথে হেজাজের দিকে যাত্রা করেন।[৩]

হজপালন করে দুই বছর দশ মাস পর ২৯ এপ্রিল ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. পবিত্র হজ পালন করে নিজ এলাকা বেরলবিতে এসে পৌঁছেন।[৪]

একটি প্রোপাগান্ডা

ভারতজুড়ে এই প্রোপাগান্ডা বেশ জোরেশোরে চালানো হয় যে, সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও তার অনুসারীরা হজের সফরে গিয়ে আবদুল ওহাব নজদির আন্দোলনের সঙ্গে শুধু একাত্মতাই পোষণ করেননি; বরং তার আদর্শের পতাকাবাহী ও প্রচারক হয়ে গেছেন। অতঃপর স্বদেশে ফিরে এসে তারা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মাঝে নজদিবাদ প্রচার করতে থাকেন।

না; এ কথা আদৌ সঠিক নয়। এটা সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ ও প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছুই নয়। মূলত ইংরেজরা সাইয়েদ আহমদ শহিদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে ব্যাহত ও নিষ্প্রভ করার

১. উলামায়ে দেওবন্দ কা শানদার মাজি : ২/১০৯
২. উলামায়ে দেওবন্দ কা শানদার মাজি : ২/১৪৪
৩. নকশে হায়াত : ২/২৩
৪. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/১৪৪

জন্য তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের মাঝে পরিকল্পনামাফিক এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়। সেই প্রোপাগান্ডা এতটাই জোরেশোরে তারা চালিয়েছিল যে, আজ অবধি বহু মানুষের করোটিতে এই ধ্যান-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। অথচ ইতিহাসের নিরিখে যাচাই-বাছাই এবং গভীর পর্যালোচনা করার পর দিবালোকের মতো এ সত্যই প্রস্ফুটিত হয় যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদি (যিনি প্রকৃতার্থে তার যুগের একজন সংস্কারক ছিলেন)-এর সাথে এবং তার আন্দোলনের সাথে সাইয়েদ আহমদ শহিদ ও তার অনুসারীদের কখনো কোনোভাবেই ন্যূনতম সম্পর্ক ছিল না। ১৭৪৬ থেকে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী নজদি শাসকদের শাসন টিকে ছিল। পরে তুর্কি ও মিশরের সামরিক বাহিনী তাদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের শক্তি সম্পূর্ণ নাশ করে ফেলে। এমনকি এই সামরিক বাহিনী নজদিদের প্রধান কেন্দ্র নজদও দখল করে নেয়। সেমতে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের পর হিজাজ ও হারামাইন শরিফে নজদিদের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি বাকি থাকেনি। শুধু তাই নয়, মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতার কারণে জনসাধারণ ও আলেম-উলামাদের মনে নজদি শাসনের প্রতি বড্ড ঘৃণাবোধ তৈরি হয়।

এই ছিল যখন হেজাজ ও হারামাইন শরিফের অবস্থা, ঠিক তখন ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. পবিত্র হজ পালনের জন্য পবিত্র নগরীতে গমন করেন। সুতরাং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের ওহাবি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু এই আন্দোলনের রূপকার মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব মারা গিয়েছেন এরও বহু আগে ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে। তার সঙ্গে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর কখনো কোনো যোগাযোগই হয়নি। এজন্য সাইয়েদ আহমদ শহিদ, তার অনুসারীগণ এবং পরবর্তীকালের আলেম, মুজাহিদদের ওহাবি বলা ইংরেজদের শত্রুতা ও প্রোপাগান্ডার একটি অংশ। বহু মাসআলার ক্ষেত্রে আজও উলামায়ে নজদ (ওহাবি) এবং উলামায়ে হক (দেওবন্দ)-এর মাঝে বিস্তর মতানৈক্য রয়েছে।

আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. তার উস্তাদ ও মুরব্বি শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ.-এর নির্দেশ ও পরামর্শে এই ইসলাহি ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা করেন। শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ.-ই ছিলেন এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক।

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. হজের সফর শেষে কলকাতা হয়ে ২৯ এপ্রিল ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে বেরলবি পৌঁছেন। এর ঠিক সাত দিন পর ৬ মে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহ আবদুল আজিজ রহ. প্রায় ৮০ বছর বয়সে দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন।

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২২৬

ফলে সাইয়েদ আহমদ হজ থেকে ফেরার পর তার মুরব্বির সঙ্গে আর সাক্ষাতের সুযোগ পাননি।

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ.-এর ইন্তেকালের পর তার উত্তরসূরি মনোনীত হয়েছিলেন শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ.।

জিহাদের সফর

হজের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে মুনশি মুহাম্মদ জাফর লেখেন, 'দেশে পৌঁছে কিছুদিন ঘরদোর ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত ছিলেন; যা তার দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। এ কাজ থেকে অবসর হয়ে তিনি পুরোদমে জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করেন।'

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল শহিদ, মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ আলেমদের বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে হিজরত ও জিহাদের প্রতি মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এ সময় সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর খানকায় মুরাকাবা, মুশাহাদা ও তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার পরিবর্তে হিজরত ও জিহাদের ফজিলত, তলোয়ার ও বন্দুক পরিষ্কার করা, লক্ষ্যস্থলে আক্রমণের প্রস্তুতি ও ঘোড়দৌড় হতে থাকে। সকলে সুফি ও দরবেশের বদলে সিপাহি বনে গেলেন। তাসবির পরিবর্তে তলোয়ার, জুব্বা ও টুপির স্থলে লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ হয়ে গেল তাদের পোশাক।

হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় দুই বছর তিনি জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তারপর ১৭ জানুয়ারি ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে বেরলবি থেকে বাহিনী নিয়ে ইয়াগিস্তান সীমান্ত সিত্তানায় অবস্থিত জিহাদের ঘাঁটির দিকে যাত্রা করেন।

জিহাদের ঘাঁটি স্থাপন

হিন্দুস্তানের অন্যান্য অঞ্চল ছেড়ে সীমান্তে জিহাদের ঘাঁটি স্থাপনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। যেমন–

এক. জিহাদের ঘাঁটি স্থাপনের জন্য এমন একটি জায়গার প্রয়োজন ছিল, যেটি হবে পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত এবং সেইসাথে অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর আধিপত্য থেকে মুক্ত। ব্রিটিশ ভারতের বাইরে অবস্থিত ইয়াগিস্তান সীমান্ত ছিল এমনই একটি জায়গা। সেখানকার সকল অধিবাসী ছিল মুসলিম।

দুই. প্রসিদ্ধ ছিল, ইংরেজদের কর্তৃত্বমুক্ত হিন্দুস্তানের আজাদ অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী পাঠান মুসলমানদের দীনদারি, ধর্মীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/১৭৭
সাওয়ানেহে আহমদ : ৮৯
তাহরিকাতে মিল্লি : ১৬; সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ : ১/২৪৯

অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক ছিল। এজন্য তাদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে সীমান্তে জিহাদের ঘাঁটি স্থাপন করা অধিক যুক্তিসংগত মনে হলো।

তিন. তৎকালে পাঞ্জাবে ছিল শিখদের রাজত্ব; যারা ছিল ইংরেজদের দোসর। পাঞ্জাবে বসবাসরত মুসলমানদের ওপর শিখদের জুলুম-নিপীড়ন চালানোর সংবাদ আসতে থাকে প্রতিনিয়ত। মুসলমানদের ওপর শিখদের এই জুলুম-নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য সীমান্তবর্তী সিত্তানা ছিল সবচেয়ে উত্তম ও নিরাপদ জায়গা।

চার. এসবের পাশাপাশি আফগানিস্তান, ইরান ও অপরাপর ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ থেকে সহযোগিতা লাভের জন্যও হিন্দুস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সীমান্ত ছিল অধিক উপযোগী।[১]

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. নিজ শহর বেরলবি থেকে যাত্রা শুরু করে গোয়ালিয়র, টুঙ্ক, আজমির, হায়দারাবাদ, সিন্দ, শিকারপুর, কুয়েটা, কান্দাহার, গজনি ও কাবুল হয়ে পেশোয়ার পৌঁছেন। অতঃপর পেশোয়ার থেকে সদলবলে সীমান্তবর্তী অঞ্চল পৌঁছেন এবং এটিকে আন্দোলন-সংগ্রামের ঘাঁটি হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সফরে প্রায় দশ মাস অতিবাহিত হয়।[২]

এ সফরে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর সঙ্গীদের সংখ্যা শুরুতে ছিল পাঁচ শ। কেন্দ্রে পৌঁছতে পৌঁছতে এর সংখ্যা দেড় হাজারে উপনীত হলো। পরে চতুর্দিক থেকে মুজাহিদদের আগমন শুরু হলো।

শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই

২১ ডিসেম্বর ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র জিহাদের সূচনা হয়। এ দিন সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর নেতৃত্বে শিখদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই হয়। এতে ৩৭ জন মুজাহিদ শহিদ এবং ৩৫ জন আহত হন। জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও অভিযান সফল হয়। এর ফলে গোটা অঞ্চলে মুজাহিদদের শক্তি ও সাহসের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকার সর্দারগণ সাইয়েদ রহ.-এর চারপাশে জমা হতে থাকে।[৩]

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও তার বাহিনীর মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের নির্মূল ও বিতাড়ন করা এবং প্রকৃত দ্বীনি ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। এর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে তার সেই পত্র, যেটি তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের শাসক রাজা হিন্দুরাওকে প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত পত্রের ভাষ্য ছিল এমন–

১. সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ : ১/৪২৩
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/১৮৯
৩. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২১৬

'ফিরিঙ্গিরা বহুদূর থেকে এসে এখানে রাজত্ব কায়েম করেছে। যে বণিকরা পণ্য বিক্রয় করত, তারা এখানে গড়ে তুলেছে সালতানাত। বড় বড় আমিরদের ইমারত, নেতাদের নেতৃত্ব মাটিতে মিশে গেছে। যারা ছিল হিন্দুস্তানের নেতৃত্ব ও রাজনীতির মালিক, তারা আজ অখ্যাত ও অবজ্ঞাত হয়ে আত্মগোপন করেছে। অবশেষে অর্থবিত্তহীন ফকির ও মিসকিনদের ভেতর থেকে স্বল্প সংখ্যক লোক বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সাহস করে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। দুর্বল মানুষদের এ দলটি কেবল আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দুনিয়াদার বা পদমর্যাদার দাবিদার নয়। হিন্দুস্তানের ময়দান যখন বিদেশি ও দুশমনদের কবল থেকে মুক্ত হবে এবং এই দুর্বলদের প্রচেষ্টার তির লক্ষ্যভেদ করবে, তখন ভবিষ্যতের জন্য রেয়াসাত (নেতৃত্ব) ও সেয়াসতের (রাজনীতির) ভার যোগ্য লোকদের ওপরই অর্পিত হবে। আমরা দুর্বলদের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের বড় নেতা এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিদের নিকট কেবল এতটুকু নিবেদন যে, আপনারা আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। আপনাদের নেতৃত্ব আপনাদের হাতেই থাকবে।'[১]

এই নাতিদীর্ঘ পত্রাংশ থেকে জানা গেল, সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর মূল লড়াইটা ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের স্থানীয় শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। অথবা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি এভাবেও বলা যায়, ইংরেজরা তাদের স্বভাবজাত ধূর্তামি ও ধুরন্ধপনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এই আন্দোলনের মোড় তাদের থেকে ঘুরিয়ে শিখদের দিখে ফিরিয়ে দিয়েছে। এর দ্বারা ইংরেজরা সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর মোকাবিলা থেকেই শুধু মুক্তি পায়নি; বরং শিখদের সাথে তাদের বন্ধুত্বটাও গাঢ় হয়ে গেছে এবং পাঞ্জাব প্রদেশের পরিপূর্ণ কর্তৃত্বও ছিনিয়ে নিয়েছে। ইংরেজরা তাদের এই কৌশলে এক তিরে দুই শিকার অর্থাৎ, সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-কে শিখদের মাধ্যমে পরাজিত করল এবং অপরদিকে স্বয়ং শিখদের রাজত্বও কেড়ে নিল।

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দুটি মৌলিক লক্ষ্য ছিল। এক. তার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছিল যে, শিখরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করছে। দুই. শিখদের রাজত্ব ছিল ইসলামি অঞ্চলসমূহ এবং ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলসমূহের মধ্যখানে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকস্বরূপ। এজন্য মধ্যখান থেকে শিখদের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত ইংরেজদের প্রতিহত করার ফুরসত মিলছিল না। তাই সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. জরুরি মনে করলেন, প্রথমে শিখদের জুলুম ও স্বৈরাচারমূলক শাসনের অবসান ঘটিয়ে তারপর একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করবেন।

এর আগে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. শিখ রাজা রঞ্জিত সিংয়ের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, যার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ–

আমরা না তোমার রাজ্য ও ধনসম্পদের প্রতি লালায়িত, আর না তোমার জান ও মর্যাদার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা আমাদের রয়েছে। প্রকৃতার্থে তোমার বিরুদ্ধে

১. নকশে হায়াত : ২/১৩-১৪

আমাদের লড়াইয়ের কোনো বাসনা নেই। আমরা শুধু এটুকুই চাই, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তোমরা আমাদের সঙ্গ দাও এবং আমাদের সঙ্গী হয়ে যাও। শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে রাজত্ব এনে আমরা তোমাকে দিয়ে দেবো। যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হও তাহলে তোমাদের ও আমাদের মাঝে যুদ্ধই হবে চূড়ান্ত।

অবশেষে শিখ রাজা রঞ্জিত সিং যখন সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর আহ্বানে সাড়া দিলো না, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল।

অস্থায়ী সরকার গঠন

১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিখদের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের পর সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ নিয়ে ১০ জানুয়ারি ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। প্রত্যেক এলাকায় গভর্নর ও মুবাল্লিগ নিয়োগ দেন। এ ছাড়া দূরদূরান্ত এলাকায় জিহাদের জন্য পৃথক পৃথক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন; যেন সে সকল অঞ্চলে জিহাদের হাতিয়ার প্রস্তুত করা যায় এবং লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়।

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর গভর্নরগণ প্রত্যেক এলাকায় ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করেন। উশর ও খেরাজ উসুলের নীতি প্রবর্তন করা হয়। সমাজ থেকে সকল প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে একটি ছোটখাটো ইসলামি রাষ্ট্র অস্তিত্বে আসে।

অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক

দিল্লির কেন্দ্রের সাথে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। সেখানে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ. প্রতিনিয়ত আন্দোলনের জন্য আর্থিক সাহায্য, জিহাদের প্রয়োজনীয় রসদপত্র সংগ্রহের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। এ ছাড়া সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. সীমান্তে আগমনের পরপরই তার একান্ত অনুসারী মাওলানা মুহাম্মদ আলি রামপুরি, মাওলানা বেলায়েত আলি, মাওলানা এনায়েত আলি, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম পানিপথি ও মাওলানা সাইয়েদ আওলাদ হাসানকে মাদরাজ, হায়দারাবাদ, বেঙ্গল ও ইউপির বিভিন্ন অঞ্চলে তাবলিগ ও সাংগঠনিক উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ সকল মারকাজে কেবল আত্মশুদ্ধিমূলক আলোচনাই হতো না; বরং মুহাজিদদের জন্য তাশকিলও করা হতো।

মুকাদ্দিমা তাহরিকে শায়খুল হিন্দের (৫৬) বরাতে সারগুজাশতা মুজাহিদিন : ১৩০

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/১৯০

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/১৯১

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/১৯১

বিশ্বাসঘাতকতা

অস্থায়ী সরকার গঠনের কয়েকদিন পর সিন্ধু নদীর তীরবর্তী এক ময়দানে শিখ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জিহাদে অবতীর্ণ হয়। লড়াই চলাকালীন এক রাতে ইয়ার মুহাম্মদ খান বিশ্বাসঘাতকা করে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর খাবারে বিষ মিশিয়ে পাঠায়। তা খেয়ে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এমতাবস্থায়ও তিনি হাতির পিঠে চড়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন। বলা হয়, এ সময় তার বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ। যুদ্ধের শুরুতে বিজয়ের পাল্লা মুজাহিদদের দিকে ভারী ছিল; কিন্তু পেশোয়ার অঞ্চলের সর্দার তার বাহিনী নিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেলে মুজাহিদদের বিজয় তখন পরাজয়ে পরিণত হয়। শেষে মুজাহিদগণ কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পার্শ্ববর্তী একটি এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে এক সপ্তাহ অবস্থানের পর সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. সুস্থ হন।

স্বার্থপর মুসলিম শাসকদের মোকাবিলা

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. তার বিরুদ্ধাচারণকারী স্থানীয় সর্দারদের মোকাবিলায় প্রথমে জিহাদের ঘাঁটি সীমান্ত থেকে সরিয়ে পাঞ্জেতরে নিয়ে আসেন। পাঞ্জেতর ছিল একটি নিরাপদ এলাকা। সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. তার পুরো শক্তি পাঞ্জেতরে একত্রিত করেন এবং এখান থেকে পরবর্তী লড়াই ও মোকাবিলার রূপরেখা তৈরি করেন। এবার শিখদের ষড়যন্ত্রে স্থানীয় সে সকল মুসলিম শাসক মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে আসতে লাগল, যারা আগে শিখদের বিরুদ্ধে ছিল। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে তারা সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর হাতে বাইয়াতও গ্রহণ করেছিল; কিন্তু নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থরক্ষায় এখন তারা শিখদের বন্ধু এবং মুজাহিদদের শত্রু হয়ে গেল।

প্রথমে সর্দার খান ওয়ালি খানের সাথে লড়াই হয়। এতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর বাহিনী জয়লাভ করে। অতঃপর ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে লড়াইয়ের মাধ্যমে মুহাজিদগণ পেশোয়ার জয় করে নেন।

মুজাহিদদের পেশোয়ার জয় ছিল রঞ্জিত সিং এবং তার অধীনস্থ রাজা-বাদশাহ ও সর্দারদের জন্য মৃত্যুর পয়গামস্বরূপ। তাই এ ঘটনায় যে সকল রাজা-বাদশাহ ও সর্দার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে এবং তারা সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করে।

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২১৭

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২১৭

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২২০

পরাজিত ও স্বার্থান্বেষী সর্দাররা ইংরেজ ও শিখদের ইশারায় সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলনকে 'ওহাবি আন্দোলন' নাম দিয়ে বদনাম ও অপপ্রচার শুরু করে। আর তৎকালে ওহাবি আন্দোলনের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ঘৃণাবোধ ছিল। এটাকে তারা পুঁজি হিসেবে লুফে নেয়। তারা বেশ তোড়জোড়ে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের সাধারণ মুসলমানদের মনে চরম ক্ষোভ ও ঘৃণা সৃষ্টির জন্য ওহাবি আন্দোলনের অপবাদ রটাতে থাকে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। ওহাবি প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিলে সীমান্তে বসবাসরত পাঠানদের মাঝে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও তার গভর্নরদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের বিদ্বেষ তৈরি হয়।

বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা ও প্রহসনমূলক ওহাবি প্রোপাগান্ডার ফলে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও আন্দোলনের ব্যাপারে জনমনে এ পরিমাণ ক্ষোভ ও দ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে যে, স্বার্থান্বেষী পাঠান সর্দারদের যোগসাজশে একই রাতে বহুসংখ্যক গভর্নর ও মুজাহিদদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শেকড় তারা উপড়ে ফেলে। বলা হয়, সে রাতে চার হাজার মুজাহিদকে গণহত্যা করা হয়েছে; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মর্মান্তিক এ ঘটনা সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. এর হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। এবার তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল, আন্দোলন-সংগ্রামে এ সকল স্বার্থপর নেতার ওপর কখনোই আর ভরসা করা যাবে না। সেমতে তিনি পাঞ্জেতর থেকে স্থানান্তর করে জিহাদের ঘাঁটি সিন্ধুতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গীদের বলে দেন, যারা বাহিনী ছেড়ে চলে যেতে চায়, তারা যেতে পারবে। কারও ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, একজন সৈনিকও তাকে ছেড়ে যেতে সম্মত হলো না। অবশেষে নতুন স্বপ্ন বুকে নিয়ে বাহিনী নিয়ে তিনি সিন্ধু পৌঁছেন।

পেশোয়ার জয়ের ১৬ মাস পর সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. পাঞ্জেতর থেকে যাত্রা করেন।

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর অস্থায়ী রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ছিল চার বছর চার মাস।

ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. পাঞ্জেতর থেকে যাত্রা করার সাথে সাথে শিখরা পেশোয়ার ও সাম্বা দখলে নিয়ে নেয়। অপরদিকে সামরিক বাহিনী

. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২২১

. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২২২

. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২২৩

. বর্তমান কাশ্মিরে অবস্থিত একটি জেলা

মুজাহিদদের ধাওয়া করে; কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। মুজাহিদ বাহিনী দ্রুত বালাকোটে পৌঁছে যায় এবং পাহাড়ের ওপর একটি নিরাপদ জায়গায় তাঁবু ও ক্যাম্প স্থাপন করে।

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর শক্তি সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটনের অভিপ্রায়ে মহারাজা রঞ্জিত সিংহের পুত্র শের সিং বালাকোট থেকে কয়েক মাইল দূরে বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অবস্থান নেয়; যেন ভবিষ্যতে শিখ রাজত্বের আর কোনো শঙ্কা ও ঝুঁকি না থাকে। এখানে শের সিং কয়েকজন নেতার বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে এবং তাদের যোগসাজশে রাতের বেলা বালাকোটের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তারপর সকাল হতেই আচমকা একযোগে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ চালায়। সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও শাহ ইসমাইল শহিদ রহ. সঙ্গীদের নিয়ে কঠিনভাবে তাদের প্রতিরোধ করেন। উভয়পক্ষের তুমুল লড়াই বাঁধে। কিন্তু শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং পূর্ব থেকে মুজাহিদদের লড়াইয়ের প্রস্তুতি না থাকার দরুন শেষমেশ তারা আর কুলিয়ে উঠতে পারেনি। বালাকোটের রণাঙ্গনে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় মুজাহিদ বাহিনী। ৭ মে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ মুতাবেক ১২৪৬ হিজরির ৪ জিলহজ শুক্রবার সেনানায়ক সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও শাহ ইসমাইল শহিদ রহ.-এর নেতৃত্বে ৩০০ মুজাহিদ শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। দীন ও দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের পাতায় নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে নেন।

যাদের রক্ত-ঘামে সিঞ্চিত হয়েছে এই মাটি
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলাম
প্রভুর রহমের শিশিরে সিক্ত হোক তাদের কবর
আমরা জানাই সালাম।

যুদ্ধ শেষে শিখ বাহিনী শহিদদের প্রতি কিছুটা সম্মান প্রদর্শন করে। শিখ বাহিনীতে যারা মুসলমান ছিল, তারা শহিদদের জানাজার নামাজ আদায় করে এবং বালাকোটেই সসম্মানে তাদের সমাহিত করে।

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর চরিত্র ও গুণাবলি

আজাদি আন্দোলনের অগ্রনায়ক সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর মাঝে সামগ্রিক গুণাবলি ও উন্নত চরিত্রের সমাহার ছিল। সিরাত ও সুরতে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানবের সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. তার প্রশংসনীয় চরিত্র ও গুণাবলির সারগর্ভ বিবরণ এভাবে দিয়েছেন–

. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ২/২২৩

. উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজি : ২/ ২২৪; সাওয়ানেহে আহমদ : ১৭৯

সাইয়েদ আহমদ রহ.-এর চরিত্র ও গুণাবলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার পরিপূর্ণ সম্পর্ক এবং নববি মেজাজ ও স্বভাব-রুচির সাথে যথোপযুক্ত সাদৃশ্য ছিল। যে কোনো ব্যক্তি এই মনীষার জীবনচরিত যথাযথ পাঠ করবে, সে হাদিস ও সিরাতের অসংখ্য ঘটনার সাথে তার সিদ্ধান্ত, কর্মপন্থা ও স্বভাব-রুচির চমৎকার সামঞ্জস্য দেখতে পাবে; আর নবিজির স্বভাব-রুচির সাথে সম্পর্কের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, যে বিষয়ে পূর্ব থেকে জানাশোনা নেই সে বিষয়েও কোনো প্রকার চেষ্টা ও লৌকিকতা ছাড়াই অনায়াসে হৃদয়-মন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি ও সুন্নাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। নিষ্কলুষ মনমানসিকতা, ভারসাম্যপূর্ণ আচার-আচরণ, ইনসাফ ও মধ্যমপন্থা, সামগ্রিকতা, লেনদেনের পরিপক্বতা, সারল্যের সাথে গভীর প্রজ্ঞা, লজ্জার সাথে সাহসিকতা ও হকের বহিঃপ্রকাশ, ক্ষমাপরায়ণতার সাথে দ্বীনি জোশ ও আত্মমর্যাদা, স্নেহ-মমতার সাথে সাথে জিহাদের প্রেরণা ও শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ, ইবাদতের আগ্রহের সাথে জিহাদের আগ্রহ এবং আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হওয়ার বাসনা, মুসলমানদের সাথে হৃদ্যতা-নম্রতার পাশাপাশি কাফেরদের সাথে কঠোরতা, অল্পেতুষ্টির সাথে সুউচ্চ মনোবল, অভাব-অনটনের সময় দানশীলতা এবং সাথি-সঙ্গীর সাথে সমানভাবে কাজকামে অংশগ্রহণ, বীরত্বের সাথে হৃদয়জাত নম্রতা, ধৈর্যধারণের সাথে উপলব্ধির সূক্ষ্মতা, বিনয়ের সাথে গাম্ভীর্যতা, গড়পড়তা জ্ঞান নয়; বরং উঁচুস্তরের জ্ঞান প্রজ্ঞা, বিরক্তি উদ্রেক করে এমন দীর্ঘ ও বিস্তারিতের পরিবর্তে সমৃদ্ধ সারসংক্ষেপ, শাখা-প্রশাখার বদলে মূলনীতির প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট করা, আপন স্বার্থ আদায়ে প্রতিশোধপরায়ণ না হওয়া, কারও অন্তরে আঘাত না দেওয়া, শরিয়তের বিধিবিধান ও শাস্তিপ্রয়োগে কোনো পরোয়া না করা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস ও মানুষের সাথে তার অবস্থান অনুপাতে আচরণ করার প্রতি সবিশেষ লক্ষ রেখে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা, যেন সে মনে করে, তার চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। এগুলো হচ্ছে সে সমস্ত গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য, যার মাঝে নবিজির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়। এই হচ্ছে নবিজির পরিপূর্ণ অনুসরণ ও যথাযথ আনুগত্যের সেই সর্বোচ্চ স্তর, যা স্বভাব-রুচি, আল্লাহ প্রদত্ত তরবিয়ত ও সুন্নতের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া ব্যতীত অর্জন হয় না।

বালাকোটের যুদ্ধে অন্য ধর্মানুসারীদের অংশগ্রহণ

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. অনেক হিন্দু রাজার সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করলেও সেনাবাহিনী ও রণাঙ্গনে আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে কোনো হিন্দু অংশগ্রহণ করেনি। রাজা রাম তুচপি নামে এক হিন্দু ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে খবর পাওয়া যায়; যিনি নিরাপদ স্থানে থেকে তোপখানার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর কতিপয় খলিফা দ্বিতীয়বার আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেন এবং ক্ষণে ক্ষণে হিন্দুস্তানে তারা জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছেন।

. সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ (রহ.) : ২/২২-৪৬৫

. নকশে হায়াত : ২/৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন অঞ্চলে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর অনুসারীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

- দিল্লি মারকাজের পৃষ্ঠপোষকতা
- সাদেকপুর অঞ্চলের আলেমদের আত্মত্যাগ
- আজাদ অঞ্চলে জিহাদি আন্দোলন

আহমদ শহিদ রহ.-এর শাহাদাত-পরবর্তী অবস্থা

বালাকোটের মর্মান্তিক ঘটনার পর সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর ভক্ত-অনুসারীগণ গেরিলা যুদ্ধের জন্য সীমান্তে জিহাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করেন।[৩৮] এই ঘাঁটির কমান্ডার ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর একনিষ্ঠ অনুসারী মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম পানিপথি রহ.। তিনি মুফাজফফরাবাদ থেকে এখানে এসে অন্যান্য মুজাহিদদের সমবেত করেন।[৩৯]

দিল্লি মারকাজের পৃষ্ঠপোষকতা

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মারকাজ ছিল দিল্লি। শাহ আবদুল আজিজ রহ.-এর তত্ত্বাবধানে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ. এটি দেখাশোনো করতেন। মুজাহিদদের জন্য অর্থ জোগাড় ও জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য হিন্দুস্তানের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করা হতো এখানে। শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-এর নির্দেশে তার জামাতা মাওলানা সাইয়েদ নাসিরুদ্দিন ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা এপ্রিল হিজরতের নিয়তে দিল্লি থেকে রওনা করেন। অতঃপর বেরলবি, জয়পুর, টুঙ্ক, আজমির, জয়পুর ও সিন্ধু হয়ে আনুমানিক প্রায় চার বছর পর ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ অথবা ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে ইয়াগিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল সিত্তানায় এসে পৌঁছেন। তিনি এসে এ ঘাঁটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৪০]

পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের এমন একটি ধারা চালু করে দিয়েছিলেন যে, লোকেরা নিজ থেকে এসে আন্দোলনে শরিক হতো এবং একে তারা নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া লেখেন–

> একজন শীর্ষস্থানীয় ইংরেজ, যে তখন দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় নীল ব্যবসায়ী ছিল–সে (প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক) উইলিয়াম উইলসন হান্টারকে বলেছিল, তার অধীনস্থ অনেক মুসলমান কর্মচারী তাদের বেতনের একটি অংশ নিয়মিত সিত্তানা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিত এবং তাদের মধ্যে যাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা অধিক ছিল, তারা কোনো না কোনো সময়ের জন্য একজন নেতার অধীনে আন্দোলনের প্রয়োজনীয় কাজ করতে চলে যেত।[৪১]

---

৩৮. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ১/২২৪
৩৯. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৩/৪
৪০. মুকাদ্দিমায়ে তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ৫৫
৪১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৩/৬

মাওলানা নাসিরুদ্দিন রহ. আন্দোলন পরিচালনার জন্য বলার মতো তেমন সময় পাননি। সিত্তানা আসার এক বছর না যেতেই মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরপারে পাড়ি জমান। ফলে তার কার্যক্রমের এখানেই সমাপ্তি ঘটে।[৪২]

মাওলানা নাসিরুদ্দিন রহ. যখন দিল্লি থেকে রওনা হয়ে সিন্ধু পেরিয়ে পাঞ্জাবে পৌঁছেন, তখন সেখানে শিখদের বিরুদ্ধে একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তারপর বেলুচিস্তান হয়ে গজনি আসেন। এখানে কাবুলের রাজা দোস্ত মুহাম্মদ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করেন; কিন্তু নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকদের কারণে এ জিহাদ শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। বহুসংখ্যক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর মাওলানা নাসিরুদ্দীন তার অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যেকোনোভাবে সিত্তানায় পৌঁছেন।[৪৩]

শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-এর হিজরত

মাওলানা নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর দিল্লির অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। স্থানীয়দের জান-মালের হুমকি বাড়তে থাকে প্রতিনিয়ত। তাই শাহ মুহাম্মদ ইসহাক তার সহোদর শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব ও অন্যান্য ভক্ত-অনুসারী নিয়ে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্তান ছেড়ে মক্কায় হিজরত করেন।

শাহ মুহাম্মদ ইসহাক হিজরত করে মক্কায় গমন করলে শাহ আবদুল গনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তী সময় তার শিষ্যবৃন্দ বিশেষত হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবি ও ইমামে রব্বানি কুতুবুল আলম মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের আজাদি আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৮৫৭-এর গোলযোগের পর শাহ আবদুল গনি মক্কায় হিজরত করেন।

সাদেকপুরের আলেমদের আত্মত্যাগ

সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর শীর্ষস্থানীয় একজন অনুসারী মাওলানা বেলায়েত আলি সাদেকপুর পাটনার অধিবাসী ছিলেন। আজাদি আন্দোলনের শুরুতেই তিনি পাটনায় আন্দোলনের একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর সীমান্ত অঞ্চল সিত্তানা সফরেও তিনি তার ভাই মাওলানা এনায়েত আলির সাথে অংশগ্রহণ করেন। পরে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর নির্দেশে বেলায়েত আলি সীমান্ত থেকে হায়াদারাবাদে চলে আসেন। কিন্তু যখন তার ভাই মাওলানা এনায়েত আলিকে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. সীমান্ত থেকে বাংলা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন, তখন মাওলানা বেলায়েত আলির কর্মকাণ্ড ইংরেজদের দোসর ও

---

৪২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৬৮
৪৩. মওজে কাউসার : ৪৪

পোষ্য হায়দারাবাদের শাসকদের পছন্দ হলো না। এজন্য তিনি হায়দাবারাদ ছেড়ে মুম্বাই চলে যান। মুম্বাইয়ে তার কার্যক্রম পরিচালনার মাঝেই বালাকোটের মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি আর মুম্বাইয়ে অবস্থান করলেন না। নিজ এলাকা পাটনায় চলে এলেন। আসার পথে বুরহানপুর, জাবালপুর, নরসিংহপুর প্রভৃত অঞ্চলে ওয়াজ-নসিহত ও দাওয়াত-তাবলিগের খেদমত আঞ্জাম দেন। এভাবে দুই বছর তিনি ক্রমাগত কাজ করেন।

আন্দোলন-সংগ্রামের সেই পদ্ধতিই তারা অবলম্বন করেছেন, যেটি ছিল সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর পদ্ধতি। অর্থাৎ, জনসাধারণের মাঝে ধর্মীয় আলোচনা করা, ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে তাদের আত্মশুদ্ধি করা। এরমধ্যে আলোচনার জন্য তারা বিশেষভাবে জিহাদের বিষয়বস্তু চয়ন করেন। সেই সাথে ক্রমান্বয়ে কুরআন ও হাদিসের পাঠদান চালু এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে জনসাধারণের মাঝে প্রচার-প্রসার করেন।

পাটনায় স্থাপিত ঘাঁটির প্রধান দায়িত্বশীল ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলি; যিনি পূর্ণ আন্দোলনের সার্বিক দেখাশোনা করতেন এবং বিভিন্ন স্থানে চলমান আন্দোলনের মুজাহিদদের দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। এমনিভাবে এই মারকাজের অন্যতম আরেক দায়িত্বশীল ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলি; যিনি সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. এর নির্দেশে বাংলা অঞ্চলে কাজ করছিলেন এবং সেখানে জিহাদের জন্য মুজাহিদদের বড় একটি কাফেলা প্রস্তুত করেছিলেন, যারা পরবর্তী সময় নেসার আলি ওরফে তিতুমীরের নেতৃত্বে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ কাফেলার মুজাহিদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ৮০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে। এমনভিাবে পাটনার ঘাঁটির সঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ আলি রায়পুরির সম্পর্কও ছিল; যিনি মাদরাজ অঞ্চলের এলাকাসমূহে কাজ করছিলেন। পাটনার ঘাঁটিতে একটি গোপন ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখানে মুজাহিদগণ এসে অবস্থান করতেন এবং পরবর্তী আন্দোলনের ছক তৈরি করতেন।

সীমান্তে যোগাযোগ

মাওলানা বেলায়েত আলি প্রায় আট-দশ বছর বাংলা, বিহার ও মুম্বাইয়ে কাজ করতে থাকেন। এর মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত আন্দোলন-সংগ্রামেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং পবিত্র হজ পালন করেন। অতঃপর ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বালাকোটের সর্দার সাইয়েদ জামেন শাহ শিখ রাজা গোলাপ সিংয়ের মোকাবিলায় সাহায্য চেয়ে তার নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। সংবাদ পেয়ে তিনি প্রথমে পাঁচ শ মুজাহিদের একটি বাহিনী মাওলানা এনায়েত আলির নেতৃত্বে বালাকোটে প্রেরণ করেন। এর কিছুদিন পর বেলায়েত আলি নিজেও জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর করেন এবং ১২৬২ হিজরির ১৭ শাওয়াল মুতাবেক ৯ অক্টোবর

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ জুমার দিন বালোকোটে পৌঁছে যুদ্ধের কামান নিজ হাতে তুলে নেন।

বালাকোটগামী এ সফরে মাওলানা বেলায়েত আলি রহ.-এর উল্লেখযোগ্য সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন-মাওলানা ফাইয়াজ আলি, মাওলানা ইয়াহইয়া, মাওলানা আকবর আলি; যিনি ছিলেন পাটনার অধিপতি মাওলানা এলাহি বখশ রহ.-এর সন্তান।

মাওলানা বেলায়েত আলি সীমান্ত থেকে চলে আসার পর মাওলানা বেলায়েত আলি রহ.-এর ছোট ভাই মাওলানা ফারহাত হুসাইনকে সাদেকপুরের প্রধান দায়িত্বশীল মনোনীত করা হয়। তিনি ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

জামেন শাহের গাদ্দারি

যুদ্ধে রাজা গোলাপ সিং পরাজিত হয়। যে সকল মুজাহিদ পাটনা থেকে জামেন শাহকে সাহায্য করতে এসেছিলেন, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জামেন শাহ তা মেনে নিতে পারল না। তাই সে বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিল। ইংরেজদের যোগসাজশে স্থানীয় লোকদের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলো। ফলে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর যুগে তার ও তার বাহিনীর যে পরিণতি হয়েছিল, তাদেরও প্রায় একই পরিণতি হয়। গোপনীয়ভাবে একটি তারিখ নির্ধারণ করে শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদদের নির্মমভাবে শহিদ করে দেওয়া হয়।

জামেন শাহের বিশ্বাসঘাকতার ফলে সৃষ্ট গণহত্যার পর মাওলানা বেলায়েত আলি সোয়াতে অবস্থিত সিত্তানা ক্যাম্পে চলে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু সোয়াত আসতে পথিমধ্যে ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন কিছু এলাকা পড়ে। প্রথমে ইংরেজরা বেলায়েত আলিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে যখন তিনি সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে তাদের এলাকায় এসে পৌঁছলেন, তখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার সঙ্গী-সাথিদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে গ্রেফতার করে পাটনা পাঠিয়ে দেয়। সেখানে দুই বছরের জন্য তাকে নজরবন্দি করে রাখা হয়।

মাওলানা বেলায়েত আলি সোয়াত অঞ্চলে হিজরতের নিয়তে সঙ্গীদের নিয়ে পাটনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। আররাহ, গাজিপুর, দিল্লি, লুধিয়ানা প্রভৃত অঞ্চল পাড়ি দিয়ে প্রায় দুই বছর পর সোয়াতের সিত্তানা ক্যাম্পে পৌঁছেন। এখানে ক্যাম্পের প্রধান মাওলানা আকবর শাহ পূর্ব থেকেই বেলায়েত আলির আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। সোয়াতে আগমনের পর উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগেই ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে বেলায়েত আলি মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরকালে পাড়ি জমান। সোয়াতেই তাকে সমাহিত করা হয়।

মাওলানা এনায়েত আলির নেতৃত্ব

মাওলানা বেলায়েত আলির ছোট ভাই মাওলানা এনায়েত আলি দলের পরবর্তী নেতা নির্বাচিত হন। তার মাঝে জিহাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা এত অধিক ছিল যে, তিনি সিত্তানা ক্যাম্প ছাড়াও ইংরেজদের দোসর আম্বের গভর্নর জাহানদাদ খানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মুজাহিদদের পৃথক ফোর্স গঠন করেন এবং ইউসুফজাই এলাকায় জনসাধারণের হৃদয়ে স্বাধীনতা ও জিহাদের জজবা তৈরি করেন। মাওলানা বেলায়েত আলির ইন্তেকালের পর তিনি সোয়াত ক্যাম্পে চলে আসেন এবং মুজাহিদরা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে।

মাওলানা এনায়েত আলি ইংরেজদের দোসর জাহানদাদ খানের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন এবং তার শক্তি দুর্বল করে দেন। জাহানদাদ খানের বাহিনীতে ইংরেজ সৈন্যদেরও নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। তথাপিও তারা কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করতে পারেনি। ইংরেজ ঐতিহাসিক ডব্লিউ হান্টার লেখেন–

> আমি সেই অপমান, আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না, যা ১৮৫৬ সালে সীমান্তের যুদ্ধে ঘটেছে। এ সময় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সীমান্ত এলাকাগুলোকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একাট্টা করে রাখে। একটি কথা থেকে সে সময়কার চিত্র অনেকটাই বুঝে আসবে। তা হচ্ছে, আমরা ১৮৫০ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক মোট ষোলোটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছি, যেখানে নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারে উপনীত হয়েছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত প্রেরিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল বিশটি, যেখানে নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যসংখ্যা ছিল পুলিশ ও অনিয়মিত সৈন্য ছাড়া মোট বিশ হাজার।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরো রাষ্ট্র বিশেষ করে পাটনা থেকে সাহায্য-সহযোগিতা আসা অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮৫৭-এর সিপাহি বিপ্লবের পর যখন পথঘাট অনিরাপদ হয়ে গেল তখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে গেল। এর ফলে মুজাহিদগণ বেশ বিপাকে পড়ে গেলেন। প্রচণ্ড অভাব তাদের চারদিক থেকে ঘিরে নিল। এ সময় গাছের পাতা খেয়ে তারা ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করলেন। কয়েক মাস টানা এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। মাওলানা এনায়েত আলি তার সমস্ত পুঁজি মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করে ফেলেন।

১৮৫৭ সালের আজাদি আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজরা সিত্তানায় অবস্থিত মুজাহিদদের ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। তখন মুজাহিদগণ ঘাঁটি ছেড়ে আশপাশের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় বাহিনীর আমির মাওলানা এনায়েত আলি ইন্তেকাল করেন। এটি ছিল ১৮৫৮ সালের ঘটনা।

পরপর এ দুটি ঘটনা মুজাহিদদের সাহস ও মনোবলে কোনো চিড় ধরাতে পারেনি; বরং তৎক্ষণাৎ তারা মাওলানা নুরুল্লাহকে আন্দোলনের পরবর্তী নেতা নির্বাচন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনিও মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। তখন তার স্থলে মির মাকসুদ আলিকে আমির নির্বাচন

করা হয়। দীর্ঘদিন তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তার মৃত্যুর পর ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা বেলায়েত আলির বড় সন্তান মাওলানা আবদুল্লাহকে আমির মনোনীত করা হয়। তিনি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তারই ছোট ভাই মাওলানা আবদুল করিম আমির হন। তারপর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাওলানা নেয়ামতুল্লাহকে আমির নির্বাচন করা হয়। তারপর মাওলানা রহমতুল্লাহ গাজি এই দায়িত্বে সমাসীন হন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই

পর্যাপ্ত জনবল ও সরঞ্জামাদির অভাবে এ সময় মুজাহিদগণ গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করেন। গোপন ক্যাম্প থেকে বের হয়ে আচমকা আক্রমণ করে শত্রুদের মনে কাঁপন ধরিয়ে দিতেন। তারপর পুনরায় তাদের গোপনালয়ে ফিরে যেতেন।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে মুজাহিদদের সরাসরি লড়াই হয়। দীর্ঘদিন এ লড়াই চলমান ছিল। এর ফলে এ এলাকায় ইংরেজদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, স্বয়ং ইংরেজদের পাঞ্জাব গভর্নর বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'ইতিপূর্বে আর কোনো যুদ্ধে আমাদের এত কঠিন ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।' প্রায় এক হাজার ইংরেজ সৈন্য এ যুদ্ধে মারা যায়।

ইংরেজদের বক্তব্য অনুযায়ী মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল তিপ্পান্ন হাজার। সকলেই ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সে সময় মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র বারো থেকে তেরো শর মাঝামাঝি। কিন্তু তাদের সাহস ও বীরত্বের সামনে ইংরেজের মতো শক্তিশালী বাহিনীও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী বিরাট দলবল নিয়ে মুজাহিদদের এই মারকাজের ওপর আক্রমণ চালায়। ইংরেজদের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় অল্পসংখ্যক মুজাহিদ। তথাপিও ইংরেজরা তাদের উদ্দেশ্যে সুফল হয়নি। মুজাহিদদের পুরোপুরি নিঃশেষ করতে সক্ষম হয়নি।

সাদেকপুর (পাটনা) মারকাজ

মাওলানা বেলায়েত আলি হিজরত করার পর মাওলানা ফারহাত হুসাইন মারকাজের দেখভাল করতে থাকেন। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তার ইন্তেকাল হলে মাওলানা ইয়াহইয়া আলি দেখভালের দায়িত্ব নেন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি বড় বাহিনীর সাথে তাকে গ্রেফতার করে ইংরেজ সরকার আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়। তারপর যিনিই এ মারকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাকেই গ্রেফতার করে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। অবশেষে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা মুবারক আলিকে গ্রেফতার ও মৃত্যুর পর দীর্ঘদিনের এ মারকাজের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সীমান্তে অবস্থিত সিত্তানা ক্যাম্পের মুজাহিদরাও এর সাথে যোগাযোগ

রক্ষা করেনি। ফলে সিত্তানার আন্দোলন কেবল তাদের নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তথাপিও এ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে প্রেরণা ও জোয়ার তৈরি হয়েছিল, তা পরবর্তী কালের আন্দোলনসমূহকে বেগবান করেছিল। শুধু তাই নয়, শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আজাদি আন্দোলনের মারকাজও এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা লাভের আগপর্যন্ত প্রতিনিয়ত এখান থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে নিয়মিতই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত ছিল। শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত সিত্তানার মুজাহিদদের আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

আজাদি আন্দোলন (সিপাহি বিপ্লব) ১৮৫৭

- রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে আজাদি আন্দোলনের সূচনা
- মিরাঠে সিপাহি বিপ্লব
- আলেমদের জিহাদের ফাতওয়া
- আন্দোলনের ব্যর্থতা ও ইংরেজদের দিল্লি দখল
- হত্যাযজ্ঞ

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৮৫৭ সাল। সময়টা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানকাল। গোটা হিন্দুস্তান ইংরেজদের করায়ত্তে চলে আসে। অপরদিকে মোঘল সাম্রাজ্য একটি প্রাণহীন বস্তুতে পরিণত হয়; যাদের প্রভাব শুধু লালকেল্লার ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও হিন্দুস্তানের জনগণ মোঘল সাম্রাজ্যকেই রাজত্বের উপযুক্ত জ্ঞান করত এবং মোঘলদের বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়ের সংবাদ তাদের অন্তরে তির হয়ে বিদ্ধ হতে থাকে। অপরদিকে ইংরেজরা তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহে বেশ জোরেশোরে খ্রিষ্টবাদ প্রচার করতে থাকে। ব্রিটেন থেকে আগত পাদরিরা শহর-নগরে বিচরণ করতে থাকে এবং হিন্দুস্তানিদের তাদের নিজেদের ধর্ম ও আদর্শ থেকে অপরিচিত বানানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। খ্রিষ্টান মিশনারিগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিষ্টবাদ প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে হাজার হাজার চিঠি ছাপিয়ে এলাকায় এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। এসবের ফলে হিন্দুস্তানি সমাজে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার পর ইংরেজরা ধর্মীয় আগ্রাসন চালাতে শুরু করলে স্থানীয় সচেতন লোকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে থাকে যে, রাষ্ট্রের ভোগ দখলের পর এখন আমাদের ধর্ম ও আদর্শও বুঝি ঝুঁকিতে নিপতিত হচ্ছে। এমন সময় একের পর এক সংবাদ আসতে থাকে যে–এক. ইংরেজরা হিন্দুস্তানিদের (হিন্দু ও মুসলিম) ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য আটার সাথে শূকরের হাড্ডি মিশিয়ে দিয়েছে, দুই. ঘিয়ের মাঝে নষ্ট চর্বি মিশিয়ে দিচ্ছে, তিন. পানি নাপাক করার জন্য কূপের ভেতর গরু ও শূকরের গোশত নিক্ষেপ করছে, চার. সবচেয়ে ভয়ানক যে বিষয়টি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তা হচ্ছে, সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত কারতুসে ইংরেজরা গরু ও শূকরের চর্বি মিশিয়ে সৈনিকদের তা মুখ দিয়ে খুলতে বাধ্য করছে।

এই সংবাদগুলো ছিল আগুনে ঘি ঢালার মতো। ফলে সাধারণ নাগরিক শুধু নয়; বরং অনেক ইংরেজ সৈন্যের মাঝেও ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিদ্রোহ নয় শুধু, বরং বলা চলে, সঠিক বিপ্লবের প্রেরণা ও জজবা তাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সর্বপ্রথম এ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ কলকাতার শহরতলী দমদম, বারেকপুর ও বাহরামপুরে বিকশিত হয়, যেখানে হিন্দুস্তানি সিপাহিরা 'দ্বীন দ্বীন' বলে

স্লোগান দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন ইংরেজরা বুদ্ধিমত্তার আলোকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে নিজেদের শক্তিবলে কঠোরতার সাথে তা দমন করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহী সিপাহিদের নেতা মোঙ্গল পান্ডে এবং তার এক সঙ্গীকে ১৮৫৭ সালের এপ্রিলে ফাঁসি দেয় এবং ইংরেজদের ৩৪ রেজিমেন্টের সাত কোম্পানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তী সময় এ সংবাদ যখন দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তখন বিশেষ ও সাধারণ নির্বিশেষে স্থানীয়দের মাঝে বিরাট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আজাদির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত হয়ে যায়।*

শাজাহানপুরে ইনকিলাবি সম্মেলন

ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল ধর্মের (হিন্দু-ইসলাম) বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান গ্রহণ। তাই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল ধর্মীয় ব্যক্তিদের হাতে। মুসলমানদের নেতৃত্বে ছিল আলেমদের হাতে এবং হিন্দুদের নেতৃত্বে ছিল তাদের পণ্ডিতবর্গের হাতে। আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরির লক্ষ্যে জানবাজ হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ অংশগ্রহণে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এসব সম্মেলনে বক্তাগণ জনসাধারণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এমনই একটি সম্মেলনের বিবরণ আজাদি আন্দোলন ১৮৫৭-এর বিশিষ্ট গবেষক ও ঐতিহাসিক ড. আইয়ুব কাদরি ইউরোপিয়ান পত্রিকা 'মারয়াম'-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেন–

শাজাহানপুরে (ইউপি) মুফতি মাজহার করিম দরিয়াবাদির বাড়িতে পহেলা মে ১৮৫৭ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মুসলমান ছাড়া অনেক হিন্দুও অংশগ্রহণ করে। সেখানে মুজাহিদদের নেতা মওলবি সরফরাজ আলি যে বক্তব্য রাখেন তা বিশেষ তাৎপর্যবহুল ছিল। তার সেই ভাষণ 'মারয়াম' নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করে–

> মওলবি সাহেব তার দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে নিচুস্বরে কিছু পাঠ করেন। তারপর সম্মেলনের চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলেন, আপনারা জানেন, ফিরিঙ্গিরা প্রতারণা করে আমাদের প্রভু বনে গেছে। বাণিজ্য করতে এসে রাষ্ট্রের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। এক প্রদেশকে আরেক প্রদেশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে এবং নিজেরা সেই বিরোধের ফায়দা লুটছে। এভাবে ছলে-বলে তারা কর্নাটক দখল করে নিয়েছে। আমরা অবগত আছি, ধূর্ত কৌশলে তারা কলকাতায় তাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কখনো ষড়যন্ত্র, কখনো তোষামোদ এবং কখনো উভয়টি দ্বারা বাদশার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার প্রাদেশিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তারপর মায়সুর (কর্নাটক রাজ্যাধীন একটি অঞ্চল)-এর ক্ষমতা এবং হিন্দুস্তানের কৃষি অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

*. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৮৫

করে। রোহিলাখন্ডের মতো বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ক্ষমতা জবরদখল করে। পাঞ্জাব ও বার্মায় স্মরণকালের ভয়াবহ জুলুম-নিপীড়ন চালায়। এভাবে অল্প অল্প করে তারা আমাদের পুরো রাষ্ট্র ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের অভিশপ্ত শাসন আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

মাওলানা সরফরাজ আলি তার ভাষণে আরও বলেন–

আপনারা বলেন, 'আমরা শাসিত জাতি। কুদরতের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এটিই বন্টন করা হয়েছে। আমাদের অভিযোগ করার কোনো অধিকার নেই।' কিন্তু হে আমার ভাইয়েরা, এখন তো আমাদের ধর্ম আর আদর্শও হুমকির মুখে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় শাসন হাতছাড়া হয়ে গেল। কাফেরদের আনুগত্য করতে হচ্ছে। শেষতক এখন কি আমরা আমাদের সেই মূল্যবান নেয়ামতও বিলিয়ে দেবো, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পেয়েছি!

কোন সব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে আমি এ কথা বলছি, তা আপনাদের অবগত করতে চাচ্ছি। বন্ধুগণ, জেনেবুঝে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়বে না। সারাদেশ কি তাদের পাদরি দিয়ে ছেয়ে যায়নি? তারা কি দেশের সর্বত্র খ্রিষ্টবাদী আকিদা-বিশ্বাসের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে না? নির্বোধ, অবিবেচক ও মূর্খদের কি তাদের দল থেকে বের করে দেওয়া হয়নি? তারা কি হাড্ডি মিশ্রিত আটা বিক্রি করতে বলেনি? তারা কি সিপাহিদের গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত কারতুস (গুলি) দেয়নি এবং সেই নাপাক জিনিস ব্যবহার করতে বাধ্য করার জন্য যেসব শহরে দেশীয় সিপাহী রয়েছে, সেখানে দুই হাজার লোহার হাতকড়ি সহকারে এই নির্দেশনা জারি করা হয়নি, যে সিপাহি দাঁত দিয়ে গুলি কাটতে অস্বীকার করবে, তাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হবে?

হে আমার হিন্দু ভাইয়েরা, আজ তোমাদের ধর্ম হুমকির মুখে। তোমাদের ধর্মীয় যে বৈশিষ্ট্যের ওপর তোমরা গর্ব করে থাকো, তা ইংরেজ বেনিয়ারা নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই তাদের মোকাবিলায় অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলো। এখনই যদি না জাগো, তাহলে বলো–আর কবে তোমরা জাগ্রত হবে? আফসোস! আমাদের মাঝে কি বুদ্ধিমান এমন একজনও নেই, যে স্বীয় ধর্মের পূতপবিত্রতা রক্ষার্থে পুরুষোচিত সাহসে বলীয়ান হয়ে আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিহত করবে? আমরা কী আজ মরে গেছি? একেবারেই মরে গেছি? কেউ একজন নেই আমাদের মাঝে এমন বীর বাহাদুর?

মাওলানা সরফরাজ আলির এমন আবেগদীপ্ত, জ্বালাময়ী ও প্রেরণাসমৃদ্ধ ভাষণে ঈদের নামাজের পর ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেওয়া হয়। 'দ্বীন' শব্দকে আন্দোলনের প্রতীক বানানো হয়। ভাষণ শেষ হতে না হতেই সম্মেলনে আগত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জোশ ও স্পৃহা তৈরি হয়। উপস্থিত হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় স্লোগান দিতে থাকে এবং মুসলমানরা উচ্চৈঃস্বরে নারায়ে তাকবির–আল্লাহু আকবার বলে স্লোগান দিতে থাকে।[১]

---

১. তাহরিকাতে মিল্লি : ৩২-৩৪

এই সম্মেলন ও প্রদত্ত বক্তব্য থেকে তৎকালীন আন্দোলন-সংগ্রামের ধরন, পদ্ধতি ও রূপরেখা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ থেকে জানা যায়, ১৮৫৭ সনের ৩১ মে গোটা রাষ্ট্রে একসাথে বিদ্রোহের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।[১]

কিন্তু কোনো কোনো স্থানে যথাসময়ের পূর্বেই জোশ ও জজবা স্থিমিত হয়ে পড়ে। যার দরুন আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়।

দক্ষিণ ভারতে সিপাহি বিপ্লবের প্রভাব

বাংলায় হিন্দুস্তানি সিপাহিদের ওপর ইংরেজদের জুলুম-নিপীড়নের সংবাদ মিরাঠের ছাউনীতে পৌঁছলে তাদের আশঙ্কা হতে থাকে, তাদেরকেও নাপাক চর্বি মিশ্রিত কারতুস দাঁত দিয়ে কাটতে বাধ্য করা হবে। দেশীয় সিপাহিরা গিয়ে তাদের আশঙ্কার কথা ইংরেজ অফিসারকে জানালে তারা বোঝানোর চেষ্টা করল যে, এমন কিছু হবে না। কিন্তু সিপাহিরা অফিসারের কথায় আশ্বস্ত হতে পারছিল না। মিরাঠে বিরাট সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ছিল এবং এখানকার তোপখানাটি ছিল রাষ্ট্রের তুলনামূলক বড় তোপখানা। এজন্য ইংরেজ প্রশাসন কল্পনাও করতে পারেনি, এখানে সিপাহিরা বিদ্রোহ করতে পারে।

ইংরেজরা ৬ মে প্রত্যেক ব্যাটালিয়ন থেকে নির্বাচিত ৯০ জন সৈন্যের একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করে কুচকাওয়াজের আয়োজন করে। কারতুস বণ্টন করে তাদের দেওয়া হয় এবং ইংরেজ অফিসাররা সেগুলো দাঁত দিয়ে কাটার নির্দেশ দেয়। ৯০ জন সিপাহির মধ্যে কেবল পাঁচ জন অফিসারের নির্দেশ পালন করে আর বাকি সিপাহি (যাদের মধ্যে ৪৯ জন মুসলিম এবং ৩৬ জন ছিল হিন্দু) অফিসারের নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়।

৯ মে সেই ৮৫ জন সিপাহির বিরুদ্ধে অফিসারের নির্দেশ অমান্যের দায়ে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাদের পদবি। সামরিক পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়। হাতকড়া পরিয়ে শহরে প্রদক্ষিণ করানো হয়। অতঃপর জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ছিল বড় বেদনাময় ও উত্তেজনাকর।

আত্মোৎসর্গকারী এই সিপাহিদের সাথি-সঙ্গীরা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন আর চুপ থাকার সময় নেই; বরং ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধের পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এসেছে।[২]

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

সিপাহিরা যখন দেখল, তাদের সাথি ও সহকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, তখন তাদের হৃদয়ে দ্রোহের আগুন এতটাই জ্বলে উঠল যে, তারা পূর্বঘোষিত

---

১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৮৮
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৮৮

নির্ধারিত তারিখ ৩১ মে-এর অপেক্ষা করল না। এর আগেই ১০ মে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলো। ব্যারেকসমূহ জ্বালিয়ে দিলো। জেলখানা ভেঙে ফেলল। শুধু নিজেদের সাথি ও সহকর্মীদের মুক্তি করেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি, বরং আট শ চরিত্রবান বন্দিকেও জোরপূর্বক মুক্ত করে আনল। এ সময় যে ইংরেজ সামনে এলো তাকেই গুলি করে হত্যা করা হলো। তারপর রাতারাতি জানবাজ সিপাহিরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দিল্লির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল এবং ১১ মে সকাল সকাল তারা দিল্লি রাজপ্রাসাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল। রাস্তার চৌকিগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে বিনাবাধায় লালকেল্লায় প্রবেশ করে মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহ জাফরের সম্মুখে গিয়ে হাজির হলো। কারণ, সাধারণ হিন্দুদের জোশ ও জজবার প্রতি লক্ষ করে এ সময় মোঘল বাহাদুর শাহ জাফর ব্যতীত এমন আর কোনো বিশেষ ব্যক্তি ছিল না, যাকে এ আন্দোলনের সিপাহসালার মনোনীত করা যায়। হিন্দু ও মুসলিম-নির্বিশেষে সকলে মেনে নেবে তৎকালে তিনিই ছিলেন দিল্লির একমাত্র ব্যক্তি।[১]

সিপাহিরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে প্রথমে বাহাদুর শাহ জাফরের নিকট হিন্দুস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং তাদের আন্দোলন ও দাবি-দাওয়া তার নিকট অর্পণ করেন (অর্থাৎ, বাদশাকে তারা তাদের আন্দোলনের নেতা ঘোষণা করতে চাইলেন)। সব শুনে বাদশাহ সিপাহিদের বললেন, 'কে আমাকে বাদশাহ বলে? আমি তো আজ একজন ফকির মাত্র। সাম্রাজ্য তো একশ বছর আগেই আমার ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। তবে অবশ্য আমি, তোমাদের ও ইংরেজদের মধ্যকার সন্ধিস্থাপনের কাজটি করে দিতে পারব। সেমতে তিনি ইংরেজ কমান্ডারকে ডেকে পাঠান এবং সরেজমিনে প্রকৃত বাস্তবতা অনুসন্ধান করেন। বাদশাহ কমান্ডারের সাথে কথা বললেন। কমান্ডার সিপাহিদের বিদ্রোহকে একটি সাধারণ ঘটনা বলে মন্তব্য করেন এবং সিপাহিদের মুখপাত্রের সামনে বিভিন্ন কথা বলে বাদশাকে সর্বাত্মকভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন।[২]

ইংরেজ কমান্ডারের বক্তব্য শুনে সিপাহিদের মুখপাত্র বলেন, আপনি যে সমস্ত অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কথা বলেছেন তা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের আত্মোৎসর্গও কম নয়। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের নির্দেশ মান্য করেছি। এমনকি বার্মা থেকে আফগাস্তিন পর্যন্ত জয় করে তার শাসনভার আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এ সমস্ত আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আমরা এই পেয়েছি যে, গরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত কারতুস আমাদের দাঁত দিয়ে কাটতে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ তা আমাদের ধর্মের পরিপন্থি। মানুষ কীভাবে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে বদদ্বীন হয়ে যাবে! আমরা মরে যেতে প্রস্তুত,

১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৮১
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৯৫

তথাপিও নিজেদের দ্বীন-ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারব না। এরজন্য ইংরেজ সরকার যা খুশি তা করুক আমাদের। আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।[১]

সিপাহি মুখপাত্রের বক্তব্য শুনে ইংরেজ কমান্ডার তাদের ক্রমাগত বোঝাতে থাকেন। কিন্তু সিপাহি বাহিনী কিছুতেই তার কথায় কর্ণপাত করছিল না। অবশেষে তার ওপর আক্রমণ হতে পারে এ শঙ্কায় ইংরেজ কমান্ডার সিপাহিদের মধ্য থেকে সরে বাদশার নিকট চলে আসেন। তথাপিও তার শেষ রক্ষা হয়নি। বাদশার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেনাছাউনীতে যাওয়ার সময় সিপাহিরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

প্রকৃতার্থেই সিপাহিরা সেদিন দ্রোহী ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেদিন তারা যেখানেই ইংরেজ অফিসারদের পেয়েছে ধরে ধরে হত্যা হত্যা করেছে। অবস্থা বেগতিক হতে শুরু করলে শহরের দায়িত্ব বাদশাহ নিজ হাতে তুলে দেন। আদালত, পুলিশ ও খাদ্য বিভাগ প্রতিটির জন্য পৃথক দায়িত্বশীল নির্ধারণ করে দেন। বলা হয়, সিপাহিদের সাহায্যে মোঘল সাম্রাজ্যের নিভু-নিভু প্রদীপ তেজোদ্দীপ্ত হয়ে জ্বলতে শুরু করে।

ইংরেজদের কৌশল

ঘটনার আকস্মিকতায় ইংরেজরা বেশ ঘাবড়ে যায়। আন্দোলনে তাদের জান ও মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই তারা পরিস্থিতি সামলে নেয় এবং দিল্লির একটি উঁচু পাহাড়ে শক্তিশালী মোর্চা স্থাপন করে। পাহাড়টি তৎকালে এ পরিমাণ উঁচু ছিল যে, সেখান থেকে পুরো দিল্লি দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে আসে। অপরদিকে পাঞ্জাবে অবস্থিত ইংরেজ সেনারা যুদ্ধের জন্য ক্রমশ দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য আসতে থাকে। সামরিক ব্যবস্থাপনা ও রসদ ইত্যাদির সর্বদিক থেকে ইংরেজরা তাদের পজিশন মজবুত করে নেয় এবং পুরো দিল্লি শহরকে তাদের তোপখানার লক্ষ্যস্থলের ভেতর নিয়ে নেয়।[২]

আন্দোলনকারীদের জোশ ও জজবা তো অনেক ছিল। কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপনার কমতি ছিল। সেইসঙ্গে রসদপত্রের স্বল্পতা তাদের লড়াইয়ের কাতারে শুরুতেই দুর্বল করে দিয়েছিল। এরই মাঝে ১৮৫৭-এর জুলাই মাসের শুরুতে রোহিলাখণ্ডের কমান্ডার জেনারেল বুখত খান একটি বড় বাহিনী নিয়ে মোঘল বংশের সুরক্ষার জন্য দিল্লিতে ছাউনী স্থাপন করে। এ বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন মাওলানা সারফরাজ আলি। এ সময় রাষ্ট্রের চারপাশ থেকে কয়েক হাজার মুজাহিদ দিল্লিতে এসে জড়ো হয়। জেনারেল বুখত খান এই পুরো বাহিনীর সুশৃঙ্খল ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করেন এবং প্রায়

১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৯৭
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/১৪৫

আড়াই মাস তারা লালকেল্লাকে নিজেদের জীবন ও রক্ত দিয়ে হেফাজত করে। এ সময় বারবার ইংরেজদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে এবং প্রতিবার তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

আলেমদের ফাতওয়া

আলেমসমাজ শুরু থেকেই রাষ্ট্রের সর্বত্র ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু জেনারেল বুখত খানের দিল্লি আগমনের পর দিল্লির প্রসিদ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ একটি ঐতিহাসিক ফাতওয়া জারি করেন, যেখানে দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সকলের জন্য জিহাদ ফরজে আইন বলে ঘোষণা দেন। সেই প্রশ্ন ও ফাতওয়া হুবহু তুলে ধরছি–

প্রশ্ন : ইংরেজ বাহিনী দিল্লি আক্রমণ করেছে। মুসলমানদের জান-মাল তাদের লক্ষ্যবস্তু। এ পরিস্থিতিতে দিল্লিবাসীর ওপর জিহাদ ফরজ হয়েছে কিনা? যদি ফরজ হয় তাহলে তা ফরজে আইন নাকি ফরজে আইন না? দিল্লি ছাড়া অন্যান্য শহরে বসবাসকারীদেরও কি জিহাদ করা উচিত? এ ব্যাপারে দ্বীনের আলেমগণের অভিমত কী? বর্ণনা করুন। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময়ে ভূষিত করুন।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে দিল্লিবাসীর ওপর জিহাদ ফরজে আইন। জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে সামর্থ্য থাকা। বহুসংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ এবং পর্যাপ্ত আসবাবপত্র থাকার ফলে যদি জিহাদ করার সামর্থ্য রাখে, তাহলে দিল্লিবাসীর ওপর জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ রয়েছে (অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে দিল্লিবাসীর ওপর এখন জিহাদ ফরজে আইন)? আর দিল্লির পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী যে সকল অঞ্চলে সংবাদ পৌঁছবে তাদের ওপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে শহরের অধিবাসীরা যদি মোকাবিলা না করে শহর ছেড়ে চলে যায়, অবহেলা করে অথবা যুদ্ধ না করে, তাহলে পার্শ্ব ও দূরবর্তীদের ওপরও জিহাদ ফরজে আইন। এমনিভাবে ক্রমাগত পূর্ব ও পশ্চিমের সকলের ওপর ফরজে আইন হয়ে যাবে। দিল্লি ছাড়াও যে সমস্ত এলাকায় শত্রুরা আক্রমণ, হত্যা ও লুটতরাজ চালায়, সে সকল এলাকার অধিবাসীদের ওপরও জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে তাদের জিহাদ করার সামর্থ্য থাকতে হবে।

উক্ত ফাতওয়ায় যে সকল আলেমের স্বাক্ষর ছিল তারা হলেন–

১. সাইয়েদ মুহাম্মদ নাজির হুসাইন
২. মাওলানা রহমতুল্লাহ

৩. মুফতি মুহাম্মদ সদরুদ্দীন
৪. মুফতি ইকরামুদ্দিন (সাইয়েদ রহমত আলি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন)
৫. মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন
৬. আবদুল কাদের
৭. ফকির আহমদ সাইদ আহমদি
৮. মুহাম্মদ মীরখান অথবা মীর মুহাম্মদ খান কিংবা মীর খান মুহাম্মদ
৯. মুহাম্মদ আবদুল করিম
১০. ফকির সিকান্দার আলি
১১. মুহাম্মদ কারিমুল্লাহ
১২. মুহাম্মদ আবদুল গনি
১৩. মাওলানা ফরিদুদ্দিন
১৪. মুহাম্মদ সারফরাজ আলি
১৫. সাইয়েদ মাহবুব আলি জাফরি
১৬. আবু আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হামিউদ্দীন
১৭. সাইয়েদ আহমদ আলি
১৮. মাওলানা ইলাহি বখশ
১৯. মুহাম্মদ মুস্তফা খান
২০. মুহাম্মদ আনসার আলি
২১. মুহাম্মদ সাইদুদ্দিন
২২. মাওলানা হাফিজুল্লাহ খান
২৩. মুহাম্মদ নুরুল হক
২৪. মুফতি রহমত আলি খান
২৫. মাওলানা হায়দার আলি
২৬. মাওলানা সাইফুর রহমান
২৭. সাইয়েদ আবদুল হামিদ
২৮. মুহাম্মদ হাশেম
২৯. সাইয়েদ হাফেজ
৩০. মুহাম্মদ ইমদাদ আলি
৩১. মুহাম্মদ আলি হুসাইন[*]

জিহাদের ফাতওয়া প্রচারের পর দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি

জেনারেল বুখত খান যদিও তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সমবেত হন এবং ফাতওয়া প্রচার হওয়ার পর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য চারদিক থেকে দলে দলে লোকেরা ছুটে আসতে থাকে, তথাপিও ইংরেজদের সুবিন্যস্ত ও অস্ত্রেশস্ত্রে

[*]. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/১৭৮

সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর মোকাবিলায় তারা ছিল দুর্বল। এতৎসত্ত্বেও দীর্ঘ চার মাস জানবাজি রেখে পূর্ণ সাহস ও উদ্যমতার সাথে তারা ইংরেজ বাহিনীর প্রতিরোধ ও মোঘল সাম্রাজ্য সুরক্ষায় প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু অবশেষে ১৮৫৭-এর আগস্টের শেষের দিকে ইংরেজ বাহিনী পুরো দিল্লি শহর কঠোরভাবে চারদিক থেকে ঘিরে নেয়। অতঃপর লালকেল্লা দখলে নেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণ শক্তি নিয়ে অভিযান শুরু করে। পথের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে হাজারো দেশপ্রেমীকের লাশ অতিক্রম করে বিশ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে লালকেল্লা দখল করে এবং কেল্লার ওপর থেকে মোঘল সাম্রাজের ঝান্ডা খুলে ব্রিটিশ-পতাকা সেখানে উড়িয়ে দেয়।[১]

বাহাদুর শাহ জাফর

ইংরেজরা লালকেল্লা দখলের একদিন পূর্বে মোঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর প্রাসাদ ছেড়ে বাদশাহ হুমায়ুনের মাকবারায় চলে আসেন এবং একটি সংকীর্ণ কুঠুরিতে আত্মগোপন করেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি তার। ইংরেজরা কেল্লা দখলের আগের দিন তাকে হুমায়ুনের সমাধি থেকে গ্রেফতার করে। তার সন্তান ও দৌহিত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আর বিদ্রোহ করার অপরাধে মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে নির্বাসন করে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়।[২]

জেনারেল বুখত খান

ইংরেজদের অবরোধ চরম আকার ধারণ করলে প্রতিরোধের আর কোনো উপায় না দেখে যখন বাহাদুর শাহ জাফর কেল্লা ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন, তখন জেনারেল বুখত খান এসে বাদশার নিকট নিবেদন জানান, তিনি যেন তার সাথে দিল্লি ছেড়ে রোহিলাখণ্ড চলে যান এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পট পরিবর্তন করেন। কারণ, তখনও ভারতবাসী মোঘল সম্রাটকেই নিজেদের নেতা হিসেবে দেখতে চায়। তিনিই ছিলেন তাদের স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু। বুখত খানের অগাধ বিশ্বাস ছিল, সম্রাট যদি সাথে থাকেন তবে এই সংগ্রাম একদিন সফলতার মুখ দেখবে। সম্রাটের নেতৃত্বেই ভারতবাসী জেগে উঠবে দুর্ধর্ষ ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সম্রাটের অধীনস্থ ইংরেজদের সুবিধাগ্রহণকারী, তল্পিবাহক কিছু দালাল তাকে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। তাকে দিল্লি ছেড়ে রোহিলাখণ্ডে যেতে বাধা দেয় তারা। অবশেষে অপরাগ হয়ে জেনারেল বুখত খান সম্রাটকে ছাড়াই নিরাপদে দিল্লি ছেড়ে রোহিলাখণ্ডে চলে যান। তার চলে যাওয়ার পরই লালকেল্লা ইংরেজ বাহিনী পূর্ণ দখলে নিয়ে নেয়।[৩]

১. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/১৬১
২. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/১৬৩

দিল্লির গণহত্যা ও নৈরাজ্য

দিল্লি দখলে নিতে ইংরেজ বাহিনী অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে হাজার হাজার জানবাজ দেশপ্রেমীকে হত্যা করে। ব্যাপক লুণ্ঠন, অরাজকতা ও লুটতরাজ চালিয়ে গোটা শহর তছনছ করে ফেলে। এখানে মানুষ বসবাস করত, দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। এভাবে তারা স্বাধীনতাকামীদের গণহত্যা ও শহরময় লুটতরাজ চালিয়ে দিল্লি দখল করে। দিল্লি দখলের সময় 'কায়সারুত তাওয়ারিখ' গ্রন্থের লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী ইংরেজরা সাতাশ হাজার মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলায়।[১]

মাওলানা আসির আদরাবি ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড টমসন লেখিত 'তাসবির কা দুসরা রুখ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, চাঁদনী চক শুধু নয়, বরং শহরের প্রতিটি অলিগলিতে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়। যেকোনো সম্মানিত মুসলমান ইংরেজদের হাতে ধৃত হলে তাকে হাতির ওপর চড়িয়ে বৃক্ষের নিচে নিয়ে যাওয়া হতো। তারপর গলায় রশি দিয়ে বৃক্ষের ডালে বেঁধে হাতি সরিয়ে নিত। আর লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ত। এমতাবস্থায় তার চক্ষুযুগল কোটর থেকে বেরিয়ে আসত। জিহ্বা মুখ থেকে বের হয়ে ঝুলে পড়ত। জবাই করা মুরগির মতো শূন্যে ছটফট করে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। তারপর দিনের পর দিন সেসব নৃশংস মৃত লাশ বৃক্ষের ঢালে ঝুলে থাকত।

এক ইংরেজ মহিলা তার ডায়েরিতে লেখেন, ফাঁসিতে লটকানো মানুষগুলো যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থিরভাবে শূন্যে হাত-পা ছড়িয়ে তড়পাতে থাকত, অনেকসময় তা ইংলিশ শিল্পকলার রূপ ধারণ করত।[২]

কখনো কখনো হত্যার জন্য এই নির্মম পন্থা অবলম্বন করা হতো যে, কোনো সম্মানিত মুসলিম নাগরিককে কামানের সামনে বেঁধে ট্রিগার চেপে দিত আর অমনি চোখের পলকে তার শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যে উড়ে যেত।[৩]

হিন্দু ঐতিহাসিক মেওয়ারাম গুপ্ত লেখেন, 'এক বক্তব্য অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে পাঁচ লাখ মুসলমানকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়।'[৪]

১. তাহরিকাতে মিল্লি : ৩৭
২. তাহরিকে আজাদি ও মুসলমান : ৩৩
৩. তাহরিকে আজাদি ও মুসলমান : ৩৪
৪. মুসলমান মুজাহিদিন : ২৪০

চতুর্থ অধ্যায়

১৮৫৭-এর আজাদি আন্দোলনে দেওবন্দিদের অংশগ্রহণ

- শামেলির জিহাদ
- ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা
- ইংরেজদের গুপ্তচরবৃত্তি
- কিরানার যুদ্ধক্ষেত্র
- মুজাহিদে আজম মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ
- ইংরেজদের স্বীকারোক্তি

১৮৫৭-এর আজাদি সংগ্রামে দেওবন্দিদের অংশগ্রহণ

মিরাঠে যখন ইংরেজ বাহিনীর অধীনস্থ সিপাহিরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে তখন থেকেই সাহারানপুর ও থানা ভবনের আশপাশে আন্দোলনের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এ সময় এক বিরাট ঘটনা সংঘটিত হয়। থানা ভবনের প্রসিদ্ধ নেতা কাজি এনায়েত আলির ভাই কাজি আবদুর রহিম তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হাতি ক্রয়ের জন্য সাহারানপুর যান। সেকালে হাতি ছিল যুদ্ধের অনেক বড় হাতিয়ার। কেউ একজন ইংরেজ বাহিনীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেয় যে, কাজি সাহেব ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য হাতি ক্রয় করতে সাহারানপুর যাচ্ছেন। সংবাদ পেয়ে সাহারানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট তাকে গ্রেফতার করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়। [illegible]

এ সংবাদ যখন থানা ভবন পৌঁছে, তখন গোটা এলাকা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

এ সময় তারা জিহাদের জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি, ইমামে রব্বানি মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ও হাফেজ জামেন শহিদ রহ. তাদের মুর্শিদ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর হাতে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারা তাদের অঞ্চলে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে সামরিক কার্যক্রমও শুরু করে দেন। [illegible]

ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা

ইসলামি হুকুমত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এর পূর্ণ বিবরণ শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. এভাবে দিয়েছেন, পুনরায় জিহাদের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং সর্বত্র এ ঘোষণা জারি করা হয় যে, হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-কে শাসক, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি রহ.-কে সেনাপতি, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-কে প্রধান বিচারপতি এবং মাওলানা মুহাম্মদ মুনির নানুতুবি রহ.-কে সেনাবাহিনীর ডানদিকের কমান্ডার ও হাফেজ জামেন শহিদ রহ.-কে বামদিকের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়েছে।

[illegible]. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩৭০

[illegible]. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/২৭৪

উপর্যুক্ত আলেমদের যেহেতু চারদিকে তাকওয়া ও ইলমের সুনাম-সুখ্যাতি ছিল, তাদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতে অসংখ্য মানুষ প্রভাবিত ছিল, লোকেরা সর্বদা তাদের দ্বীনদারি ও খোদাভীরুতা অবলোকন করছিল, এজন্য তাদের ওপর অনেক বেশি ভরসা করছিল। ভক্ত-মুরিদান ও ছাত্র-শিষ্য ছাড়া সাধারণ নাগরিক সমাজও তাদের প্রতি আস্থাশীল ছিল। তাই খুব অল্প সময়েই তাদের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক মানুষ জমায়েত হতে থাকে।

তখন পর্যন্ত তাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্রের তেমন বন্দোবস্ত ছিল না। সাধারণত লোকদের নিকট যে সকল হাতিয়ার থাকে এবং তৎকালে মুসলমানরা যেগুলো রাখা নিজেদের জন্য জরুরি মনে করত, কেবল তাই ছিল। কিন্তু সেগুলোও ছিল বেশ প্রাচীন সময়ের। পুরোনো দিনের সাধারণ বন্দুক ছিল; কিন্তু কারতুস ও রাইফেল ছিল না। এসব কেবল ইংরেজ বাহিনীর নিকট ছিল।

এভাবে হাজার হাজার মুজাহিদ সমবেত হয়ে যায় এবং থানা ভবনের আশপাশের অঞ্চলগুলোর সমন্বয়ে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে। ইংরেজদের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত যে সকল বিচারক ছিল, তাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়।

এ সময় থানাভবনে সংবাদ আসে, ইংরেজ বাহিনীর তোপখানা সাহারানপুর থেকে স্থানান্তর করে শামেলিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন শুধু এক প্লাটুন সৈন্য সেখানে রয়েছে। রাতে তারা এই পথ দিয়ে তোপখানাসহ অতিক্রম করবে। এই সংবাদে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। কেননা, মুজাহিদদের নিকট হাতিয়ার বলতে শুধু তলোয়ার, সাধারণ ভাঙাচোরা বন্দুক ও বর্শা ইত্যাদি ছিল। কিন্তু কোনো কামান ছিল না তাদের নিকট। তাহলে ইংরেজদের তোপখানার মোকাবিলা করা হবে কীভাবে। সকলের অস্থিরতা ও বেচাইনি দেখে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. তাদের বললেন, তোমরা এ নিয়ে চিন্তিত হয়ো না।

ইংরেজ বাহিনী যে সড়ক দিয়ে থানা ভবন অতিক্রম করবে সেটা ছিল একটি বাগানের পাশে অবস্থিত। হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-এর নেতৃত্বে ত্রিশ-চল্লিশ জন মুজাহিদের একটি বাহিনী গঠন করে দিলেন। গাঙ্গুহি রহ. মুজাহিদদের নিয়ে বাগানের ভেতর চলে গেলেন। তাদের তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা বাগানের ভেতর লুকিয়ে থাকবে এবং আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। আমি যেই মাত্র নির্দেশ দেবো সঙ্গে সঙ্গে সকলে একযোগে ফায়ার শুরু করবে।

মুজাহিদ বাহিনী সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে বাগানের ভেতর লুকিয়ে থাকে। যখন ইংরেজ বাহিনী তোপখানা নিয়ে বাগানের সামনে আসে তখন কমান্ডার রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-এর নির্দেশে একসাথে ফায়ার শুরু করে। এতে ইংরেজ বাহিনী বেশ ঘাবড়ে যায় এবং ভাবতে থাকে, না জানি এখানে কী পরিমাণ মানুষ লুকিয়ে আছে। তখন তারা তোপখানা ফেলে জান হাতে কোনো রকম

পালিয়ে যায়। তারপর রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. বাগান থেকে বের হয়ে এসে তোপখানার দখল নেন এবং তা নিয়ে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর মসজিদের সামনে রাখেন।

এ ঘটনায় তাদের বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি, যুদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শিতা, সকল বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞা এবং সার্বিক যোগ্যতার ব্যাপারে জনসাধারণের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয়।

তৎকালে শামেলি ছিল মুজাহিদদের প্রধান কেন্দ্র। সেখানে তাহসিল (খাজনা প্রদানের দফতর) ও ছোটখাটো একটি সামরিক ঘাঁটিও ছিল। মুজাহিদগণ শামেলিতে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যথারীতি আক্রমণ করে শামেলি দখল করে নেন। পুলিশ ও সৈন্য যারা ছিল, তারা পরাজিত হয়। এ অভিযানে মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার হাফেজ জামেন রহ. শহিদ হন।[১]

ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত সিপাহসালার হাফেজ জামেন রহ.-এর শাহাদাতের পর হিন্দুস্তানের চিত্র আমূল পালটে যায়। আন্দোলন-সংগ্রামে ভাটা পড়ে। তার শাহাদাতের পূর্বে প্রতিনিয়ত সংবাদ আসছিল, আজ অমুক অঞ্চল ইংরেজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অমুক এলাকা হিন্দুস্তানিদের করায়ত্তে এসেছে। কিন্তু হাফেজ জামেন রহ.-এর শাহাদাতের পরপরই সংবাদ আসে, ইংরেজ বাহিনী দিল্লির দখল নিয়েছে। অতঃপর ক্রমাগত অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অনুরূপ সংবাদ আসতে থাকে। মুহূর্তে যেন দৃশ্যপট পালটে যেতে থাকে। অথচ হাফেজ জামেন রহ.-এর শাহাদাতের পূর্বে সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর জয়জয়কার ছিল। একেকজন হিন্দুস্তানি সিপাহি ইংরেজদের একেক বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। এক ইংরেজ সেনা একটি কৃষি জমিতে আত্মগোপন করেছিল। স্থানীয় কৃষাণী তাকে ধরে মেরে ফেলে। স্থানীয় জনগণ ও সিপাহিদের আত্মবিশ্বাস কী পরিমাণ তুঙ্গে ছিল তা এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু হাফেজ জামেন রহ. সম্মুখ লড়াইয়ে শহিদ হলে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যায়।

দিল্লির পতন

১৮৫৭-এর ১৯ ডিসেম্বর যখন দিল্লিতে মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে গ্রেফতার করা হয় এবং ইংরেজরা দিল্লি পরিপূর্ণ কব্জা করে নেয়, তখন সেখানে যেরূপ হত্যা, লুটতরাজ চালানো হয়, তেমনই দিল্লির আশপাশের অঞ্চলগুলোতেও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙে পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যে ইংরেজ বাহিনী থানা ভবনের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। শহরবাসী প্রতিরোধের চেষ্টা করে; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতার কারণে দুই ঘণ্টার বেশি তারা প্রতিরোধ

১. নকশে হায়াত : ২/৫৭

করতে পারেনি। ইংরেজ বাহিনী রাতে আক্রমণ শুরু করে। ভোরের আলো ফোটার আগেই থানা ভবন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। শক্তিশালী গোলা মেরে শহরের প্রাচীর ধসিয়ে দেয়। দরজাগুলো ভেঙে ফেলে। কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। এ সময় যাকেই পেয়েছে তাকে হত্যা করে। দেখতে দেখতে চোখের পলকে থানা ভবন যেন এক বিরান ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। চারপাশের দৃশ্যাবলি আমূল বদলে যায়।

এক ধারণা মতে থানা ভবনের শহিদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এরা হচ্ছেন তারা, যারা ইংরেজ বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ লড়াই করেছেন। এ ছাড়া ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা থানা ভবন ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজদের হাতে ধৃত হয়ে নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে পড়েছেন এমনকি শহিদ হয়েছেন; তাদের সংখ্যা এর বাইরে।

ইংরেজদের থানা ভবন অপারেশনের পর প্রায় দুই বছর এ শহর বিরান হয়ে পড়ে ছিল। পরবর্তী সময় ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হলে পুনর্বার থানা ভবন আবাদ হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এ সময় এলাকায় ফিরে একশ বিশ জন শহিদের মরদেহ গাছের ডালে ঝুলতে দেখেন। অপারেশন পরিচালনার সময় ইংরেজ বাহিনী তাদের গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। কিন্তু একজন শহিদের লাশও কোনো পোকামাকড় খায়নি এবং কোনো জন্তু-জানোয়ার স্পর্শ করেনি দেখে এলাকাবাসী যারপরনাই বিস্ময়বোধ করে। শরীরের গোশতগুলো শুকিয়ে যথাস্থানে রয়ে গিয়েছিল।

আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আলেমদের পরিণতি

বাহিনীর মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ ও সাহসী মুজাহিদ হাফেজ জামিন রহ. তো শামেলির রণাঙ্গনেই শহিদ হয়েছেন; আর অন্যান্য নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ কোনো না কোনোভাবে জানে বেঁচে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. প্রায় দুই বছর আম্বালা, পাঞ্জলাসা ও তিগড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে আত্মগোপনে থেকে মক্কা মুকাররমায় হিজরত করেন। মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. নয় মাস আত্মগোপনে থাকার পর ইংরেজদের হাতে গ্রেফতার হন। ছয় মাস তিনি কারাপ্রকোষ্ঠের নির্যাতন সহ্য করেন। পরবর্তী সময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর তিনি বন্দিশালা থেকে ছাড়া পান।

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবি রহ. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগপর্যন্ত পূর্ণ সময় আত্মগোপনে ছিলেন। এ আন্দোলনের অন্যতম রূপকার কাজি

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/২৮১
উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৫০৮
উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৫০৭
উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৫০৮
উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/২৮৯

এনায়েত আলি থানা ভবন থেকে বের হয়ে বিজনুর চলে যান। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকেন এবং বেশ কয়েকটি লড়াইয়ে ইংরেজদের পর্যুদস্তও করেন। অতঃপর বিজনুর থেকে মিরাঠ হয়ে বন্দিলখণ্ড এলাকায় চলে যান। সেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করতে থাকেন। এভাবে চলতে থাকে। অতঃপর ক্রমশ পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে থাকলে একপ্রকার বাধ্য হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নেন। কিছুদিন ভুপাল ও যোধপুরে চাকরি করেন। শেষ বয়সে তিজারা শহরে বসবাস করেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন।

ইংরেজদের গোয়েন্দাবৃত্তি

উলামায়ে দেওবন্দের যে সকল আলেম আত্মগোপনে চলে যান ইংরেজ বাহিনী তাদের অনুসন্ধানে নেমে পড়ে। ইংরেজদের চূড়ান্ত ক্ষোভ ছিল তখন আলেমদের ওপর। কিন্তু সে সকল আলেমের সাথে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর সাহায্য ছিল। কোথাও কোথাও তো গোয়েন্দারা তাদের অবস্থানের সঠিক সংবাদ সৈন্যদের অবহিতও করেছে। কিন্তু সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সেনারা যখন অনুসন্ধান ও গ্রেফতারের জন্য যথাস্থানে পৌঁছে, তখন আল্লাহর বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে তাদের বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পায়। ফলে তাদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয় তারা।

কিরানার আন্দোলন

যখন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর নেতৃত্বে থানা ভবন ও এর আশপাশের অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অপরদিকে প্রসিদ্ধ তার্কিক মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবি রহ. তার একনিষ্ঠ সঙ্গী ও সর্দার চৌধুরি আজিমুদ্দিনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিরানায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুজাহিদগণ কিরানা ও এর আশপাশ থেকে ইংরেজ শাসনের মূলোৎপাটন করে থানা ভবনের আদলে নতুন ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে। তখন যেকোনো ঘোষণায় এ কথা বলা হতো যে, 'মুলক খোদা কা, হুকুম মওলবি রহমতুল্লাহ কা'। অর্থাৎ, রাষ্ট্র আল্লাহর এবং শাসন চলবে মওলবি রহমতুল্লাহর।

বাহ্যিকভাবে এই হুকুমত অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। কিন্তু কিছু গোয়েন্দার গুপ্তচরবৃত্তি এবং নিজেদের অসতর্কতার দরুন তা বেশদিন স্থায়ী হয়নি। দিল্লি দখলের পর ইংরেজ বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আচমকা একদিন কিরানায়

উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/২৭৯
উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩০৮

অপারেশন চালায় এবং মাওলানা রহমতুল্লাহকে তালাশ করতে থাকে; কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও তারা মাওলানাকে ধরতে পারেনি। তিনি কোনো রকম জানে বেঁচে কিরানা থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে আত্মগোপন করেন। অতঃপর এখান থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লি চলে যান। দিল্লি থেকে যোধপুর, তারপর সুরাত হয়ে মক্কা মুকাররমায় পাড়ি জমান। সেখানে তিনি আল-মাদরাসাতুস সাওলাতিয়্যা নামে একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও পুরোদমে চালু আছে। ১৩০৮ হিজরি সনে পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

অন্যান্য শহরে আন্দোলনের চিত্র

১৮৫৭ সনে রাষ্ট্রের যেখানে যেখানে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, এর নেতৃত্ব সাধারণত আলেমদের হাতে ছিল। যেমন, আলিগড়ে প্রায় দুই মাস পর্যন্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব মাওলানা কাজি আবদুল জলিল ও মাওলানা রিয়াজুদ্দিনের হাতে ছিল। তাদের নেতৃত্বেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুদ্ধ হয়, যেখানে তাদের ৭২ জন সঙ্গী মরণপণ লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।

এমনিভাবে রোহিলাখণ্ড ও এর পার্শ্ববর্তী শহর মুরাদাবাদে ইংরেজবিরোধী যে লড়াই হয়েছে সব কটিতে আলেমদের উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব ও ভূমিকা ছিল। বাদায়ুনের আন্দোলনেও আলেমগণ সম্মুখসারিতে ছিলেন। তন্মধ্যে মাওলানা ফয়েজ আহমদ বাদায়ুনি রহ.-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি খ্রিষ্টান পাদরি এন্ড্রু ফিন্টরের সাথে বিতর্কের সময় মাওলানা রহমতুল্লাহ কেরানবি রহ.-এর সহযোগী ছিলেন।

একইভাবে মুরাদাবাদের আলেম মুজাহিদদের মধ্য থেকে মাওলানা কেফায়েত আলি কাফি শহিদ রহ.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যাকে ১৮৫৭-এর এপ্রিলে ইংরেজরা গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে।

কথিত আছে, মাওলানা কেফায়েত আলি শহিদ রহ.-কে যখন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর জন্য বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি একটি ছন্দময় কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। উক্ত কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এমন–

'শোভিত গোলাপ ফুটে থাকবে। সেজে থাকবে মনোরম পুষ্পোদ্যান। চিরদিনই শোভিত থাকবে রাসুলুল্লাহর দ্বীনের সৌন্দর্য।

. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩০৯
. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩১১
. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩১৬
. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩৬০
. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩৭৮

আমরা তো আগন্তুক মাত্র। ক্ষণিকের আনন্দধ্বনির মতো, পরক্ষণেই তা মিলিয়ে যাবে। বুলবুলি উড়ে যাবে। স্বর্ণ-রুপা রয়ে যাবে।

গায়ের ছেঁড়াফাঁটা পোশাক দেখে বেজার হয়ো না। মনে রেখো, এই দেহ ও মনকে একদিন ঢেকে নেবে সামান্য কাফন।

যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর ওপর দরুদ পাঠ করবে, তার দেহসৌষ্ঠবকে স্পর্শ করবে না ফুটন্ত আগুন।

একদিন সব শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু রাসুলুল্লাহর প্রশংসায় সিক্ত পবিত্র মুখগুলো রয়ে যাবে শুধু অমলীন।'

মুরাদাবাদের জানবাজ মুজাহিদদের মধ্যে মওলবি মিনহাজুদ্দিন ওরফে মওলবি মনুর নামও বেশ প্রসিদ্ধ। তিনিও নিপীড়িত অবস্থায় শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে পরজগতে পাড়ি জমান। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে যান তার তুলনারহিত বীরত্বগাথা।

এক মহান মুজাহিদের অমর কীর্তি

১৮৫৭-এর আজাদি আন্দোলনে মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহের নাম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাহস ও বীরত্বে তিনিও সর্বত্র আলো ছড়িয়েছেন। তিনি নিজ এলাকায় বসবাস করতেন। শুরু থেকেই তার মাঝে আন্দোলন ও সংগ্রামের দারুণ স্পৃহা ছিল। মহীশুরের বীর টিপু সুলতানের শাহাদাতের পর তার মাঝে জিহাদের প্রেরণা জাগে। বংশীয়ভাবে অঢেল ধনসম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উলামা-মাশায়েখদের সংস্পর্শে উপকৃত ও ঋদ্ধ হওয়ার জন্য হায়দারাবাদ, বেইপার, গোয়ালিয়র, টুঙ্ক হয়ে তিনি দিল্লি গমন করেন। অধিক সম্ভব তখন ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ, যখন পাঞ্জাব ও সীমান্তের সিত্তানা থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন চলছিল। মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ দিল্লির শীর্ষস্থানীয় আলেমদের পরামর্শে আগ্রা গমন করেন। আগ্রার দ্বীনি অবস্থা তখন বেশ নাজুক ছিল। ঠিক কতটা নাজুক ছিল তা এর থেকে সহজে অনুমেয় যে, আগ্রার মতো বিরাট একটি শহরে মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ জন মুসল্লি জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করত। মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ রহ. কয়েকদিনে গোটা শহরের চিত্র আমূল পরিবর্তন করে ফেলেন। প্রতিদিন তার ওয়াজের মজলিসে দশ হাজার পর্যন্ত লোক সমাগম হতে থাকে।

মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া লেখেন, আগ্রার যে জামে মসজিদে জুমার দিন বিশ থেকে পঁচিশ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করত, আহমদুল্লাহ শাহ আগমনের পর তার দাওয়াত ও ওয়াজ-নসিহতে প্রতিটি মসজিদে বহুসংখ্যক লোক সমাগম

. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩৭৯
. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৩৮৪

হতে শুরু করে। যে মসজিদগুলো বহুদিন বিরান হয়ে পড়েছিল সেগুলো লোকেরা আবাদ করতে থাকে। জনসাধারণের মাঝে মাওলানার সুনাম ও সুখ্যাতি এ পরিমাণ ছিল যে, তিনি যেখানেই যেতেন ভক্ত-মুরিদদের বিরাট কাফেলা তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটত। লোক মাঝে তার এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা দেখে ইংরেজ প্রশাসন চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাকে নিজেদের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করতে থাকে। সেমতে তার সাথিদের ওপর অন্যায় ও অমূলকভাবে মামলা মুকাদ্দমা দিয়ে গ্রেফতার ও বন্দী করে শাস্তি দিতে শুরু করে। তিনি এই পরিস্থিতি দেখে আগ্রা ছেড়ে দেওয়া সংগত মনে করেন এবং কানপুর হয়ে লক্ষ্ণৌ চলে যান। এখানেও তিনি আগ্রার মতো বিপুল সমাদর ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু এখানকার ইংরেজ প্রশাসন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই তিনি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে ফয়েজাবাদ চলে যান। এখানে এসেই তিনি বিপদের সম্মুখীন হন। ইংরেজ সরকার তাকে গ্রেফতারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। আহমদুল্লাহ শাহের ভক্ত-মুরিদগণ ইংরেজ সৈন্যদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র না থাকার দরুন তারা সহজেই ইংরেজদের কাছে নত হতে বাধ্য হয়। ইংরেজ বাহিনী তাদের পরাস্ত করে আহমদুল্লাহ শাহকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং জেলখানায় বন্দি করে রাখে। তিনি জেলখানায় থাকাকালীন ১৮৫৭-এর মে মাসে সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। তখন আহমদুল্লাহ শাহের স্থলাভিষিক্ত মাওলানা ইসকান্দার শাহ ফয়েজাবাদি মুজাহিদদের নিয়ে জেলখানা ভেঙে তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে তড়িঘড়ি লক্ষ্ণৌ রওনা করেন এবং সেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরির জোর প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু শিয়া ও সুন্নি বিরোধ এবং অন্যান্য আরও অনেক প্রতিবন্ধকতার দরুন তিনি তার চেষ্টায় সফল হননি। এখানে না পেরে তিনি শাজাহানপুর চলে যান এবং পরবর্তী সময় মুহাম্মদি উপশহরে গিয়ে একটি অস্থায়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে জেনারেল বুখত খান, মাওলানা সারফরাজ আলি, মাওলানা লেয়াকত আলি এলাহাবাদি ও মাওলানা ফয়জুল্লাহ বাদায়ুনির মতো শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন।

মুহাম্মদিতে প্রতিষ্ঠিত হুকুমত বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মূলত এ পরিকল্পনা বিকশিত হওয়ার পূর্বেই ইংরেজ বাহিনী সেখানে অভিযান চালায়। যার ফলে আহমদুল্লাহ শাহের সহযোগী যারা ছিলেন তারা কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে নেপালের দিকে চলে যান। আর তিনি পুনে শহরের দিকে যাত্রা করেন।

-. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৪১০
-. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/৪৩০

আহমদুল্লাহ শাহের শাহাদাত

আহমদুল্লাহ শাহ পুনে পৌঁছার পর সেখানকার রাজা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। সেমতে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কিন্তু দুর্গের নিকটবর্তী হলে বিশ্বাসঘাতক রাজা ওপর থেকে গুলি করে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। মুফতি ইনতেজামুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাজা বলদেভ সিং তার মাথা শরীর থেকে কেটে শাহজাহানপুরের কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করে। তারপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ মহান মুজাহিদের মাথা থানার সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দেহ আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। ব্রিটিশ সরকার এতে খুশি হয়ে পুনের রাজার নিকট নগদ পঞ্চাশ হাজার রুপি এবং গৌরবময় উপঢৌকন প্রেরণ করে। এ ঘটনা ১৮৫৮ সনের জুন মাসের পাঁচ তারিখ মুতাবেক ১৩ জিলকদ ১২৭৫ হিজরি সনে সংঘটিত হয়।

ইংরেজদের স্বীকারোক্তি

আহমদুল্লাহ শাহের মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার এ পরিমাণ আনন্দ প্রকাশের কারণ হলো, তৎসময় ইংরেজ সরকার আহমদুল্লাহ শাহকে দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু ও প্রতিপক্ষ মনে করছিল। তিনি যে সাহস ও বীরত্বের সাথে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, স্বয়ং ইংরেজ বাহিনী তার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। অনেক ইংরেজ লেখক তাদের লেখনীতে আহমদুল্লাহ শাহের প্রসঙ্গ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। যেমন, জেনারেল টমসন, যিনি একজন সাহসী ইংরেজ লেখক ছিলেন এবং ১৮৫৭-এর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন; তিনি আহমদুল্লাহ শাহ সম্পর্কে লেখেন–

> মওলবি আহমদুল্লাহ শাহ আন্দোলন-সংগ্রামে বেশ চৌকষ ও পারদর্শী ছিলেন। তার সাহস ও বীরত্ব এ পরিমাণ ছিল যে, তার অন্তরে ভয় বলতে কিছু ছিল না। তিনি দৃঢ় সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন। বিদ্রোহীদের মাঝে তার মতো দ্বিতীয় আর কোনো সিপাহি ছিল না। দুই-দুই বার সেনাপতি কলিন ক্যাম্বেলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করার গৌরব রয়েছে তার। তিনি প্রকৃতার্থেই শাহ উপাধির যোগ্য ছিলেন। দেশপ্রেমের অর্থ যদি এটি হয় যে, সকল পিছুটান উপেক্ষা করে রাষ্ট্রের আজাদির জন্য নিজের জীবন কুরবান করে বীর-বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাওয়া, তাহলে এই মওলবি ছিলেন সেই দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তিনি কখনো অস্ত্র লুকিয়ে এবং প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কোনো শত্রুর রক্ত প্রবাহিত করেননি। সর্বদা বুক উঁচু করে সাহসের সাথে তাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন, যারা তার দেশকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বলে তিনি মনে করতেন। দুনিয়ার সকল জাতি-গোষ্ঠী-নির্বিশেষে পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে তাকে এবং তার অসামান্য বীরত্ব ও সততাকে স্মরণ করবে।

-. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪/২৪১
-. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪৩৩

অন্য এক ইংরেজ অফিসার বলেন–

ফয়েজাবাদের মৌলবি সম্পর্কে এ কথা বলা অত্যাবশ্যক যে, তিনি আলেম বা-আমল (অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করা) হিসেবে মওলবি ছিলেন; আধ্যাত্মিক শক্তির বিচারে সুফি ছিলেন এবং সামরিক দক্ষতার দিক থেকে একজন চৌকষ সিপাহি ও সিপাহসালার ছিলেন। পূতপবিত্র স্বভাবের ছিলেন। প্রত্যেক ইংরেজ তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত।[৮০]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আজাদি আন্দোলনের মূল প্রাণশক্তি ও পতাকাবাহী ছিলেন ভারতবর্ষের আলেমসমাজ। প্রত্যেক অঞ্চলে প্রভাবশালী ও জনসাধারণের নিকট বরিত আলেমদের অধিকাংশই মোঘল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তার জন্য সকল প্রকার আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও সর্বাবস্থায় নেতৃত্ব ও পরিচালনার রশি ছিল আলেমদেরই হাতে। কিন্তু ইংরেজদের সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক দক্ষতা এবং নবাব ও রাজা-বাদশাদের গোপন ষড়যন্ত্র তাদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয় এবং ১৮৫৭-এর পর গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজ বাহিনী যে গণহত্যা, লুটতরাজ চালায় তাতে বিশেষ ও জনসাধারণ সকলের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে এসে মুসলমানরা ক্লান্ত ও ভীত হয়ে পড়ে। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.-এর ভাষ্যমতে, তৎকালীন জাতীয় সকল সংগঠনের গঠনতন্ত্রে বিসমিল্লাহর পর প্রথম কথা এটা বলা হতো, এই সংগঠন কখনো রাজনীতির সাথে জড়াবে না।[৮১]

ইংরেজ শাসনের এমনতর কঠিন সময়ে মুখে যদিও আজাদির কথা প্রকাশ করা অপরাধ ছিল, কিন্তু কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য আলেমসমাজ সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন; যার ফলাফল পরবর্তী সময় তাহরিকে শায়খুল হিন্দের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে।

[৮০]. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪৩৩
[৮১]. উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি : ৪৮৭

পঞ্চম অধ্যায়

তাহরিকে শায়খুল হিন্দ রহ.

- রেশমি রুমাল আন্দোলন
- আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও সূচনা
- সামারাতুত তরবিয়ত এবং জমিয়তুল আনসার
- সিন্ধুতে আজাদি আন্দোলন
- নাজারাতুল মাআরিফ দিল্লি
- প্ল্যান-পরিকল্পনা
- শায়খুল হিন্দ রহ.-এর হেজাজ সফর
- আন্দোলনের গোপনীয়তা ফাঁস
- শায়খুল হিন্দের গ্রেফতার ও মাল্টার নির্বাসন
- বিচার-বিশ্লেষণ

রেশমি রুমাল আন্দোলন

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আন্দোলনকে রেশমি রুমাল আন্দোলন বলার কারণ হলো, ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আন্দোলন কিছুটা রেশমি রুমালের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। একটি রুমালে এ আন্দোলনের মূল পরিকল্পনার ছক আঁকা ছিল। সেজন্য ইংরেজরা এ আন্দোলনকে তাহরিকে রেশমি রুমাল নামে প্রসিদ্ধ করে দেয়।[illegible]

আন্দোলনের সূচনা ও প্রেক্ষাপট

১৮৫৭-এর মহাবিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর দরদি আলেমগণ ১৮৬৬ সনে দেওবন্দে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন; আজ যা বিশ্বব্যাপী দারুল উলুম দেওবন্দ নামে সমধিক পরিচিত। এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মনীষা ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গঠন করা এবং ইংরেজদের ছড়িয়ে দেওয়া মনস্তাত্ত্বিক ধর্মীয় বিষবাষ্প প্রতিরোধ করা। এ প্রতিষ্ঠান একটি মাদরাসা ছিল না শুধু, বরং একটি শক্তিশালী ইসলামিক দুর্গ হিসেবে ধর্ম ও জাতির নানামুখী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছিল।

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এ প্রতিষ্ঠানের রূপকার হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবি রহ.-এর নির্দেশে এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে সামারাতুত তরবিয়ত নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবি রহ.। সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ছিলেন দারুল দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ.; যিনি পরবর্তী সময় বিশ্বময় শায়খুল হিন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। এ ছাড়া অন্যান্য সদস্য যারা ছিলেন তারা হলেন–

১. মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহি রহ.
২. মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহি রহ.
৩. মাওলানা আবদুল হক পুরকাজি রহ.
৪. মৌলবি মুহাম্মদ ফাজেল ফুলতি রহ.

[illegible]. তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ৬১

৫. মৌলবি মীর মুহাম্মদ সাদেক মাদরাজি রহ.
৬. মৌলবি আবদুল কাদের দেওবন্দি রহ.
৭. মৌলবি ফাতহ মুহাম্মদ থানবি রহ.
৮. মাওলানা আবদুল্লাহ আম্বটি রহ.
৯. মাওলানা মুহাম্মদ মুরাদ (পাকপটন নিবাসী)
১০. মাওলানা আবদুল্লাহ গোয়ালপাড়ি রহ.
১১. মাওলানা আবদুল আলি মিরাঠি রহ.
১২. মাওলানা নেহাল আহমদ দেওবন্দি রহ.
১৩. মাওলানা আবদুল লতিফ সবাসপুরি রহ.
১৪. মাওলানা আবদুল্লাহ জালালাবাদি রহ.
১৫. মৌলবি মুহাম্মদ আলি রহ.
১৬. মৌলবি আবদুল আদিল ফুলতি রহ.
১৭. মাওলানা কাউসার নাগিনবি রহ.
১৮. মাওলানা কেরামত আলি দেহলবি রহ.।

সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য কী ছিল–এর জবাবে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া রহ. বলেন, সামারাতুত তরবিয়তের উদ্দেশ্য কেবল দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতী ছাত্রদের সুসংগঠিত ও পরিচালনা করাই ছিল না; বরং এর প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল ১৮৫৭-এর ক্ষতিপূরণে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাওয়া।[illegible]

সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বছর পর ১২৯৭ হিজরি সনে হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবি রহ. ইন্তেকাল করেন। এর ফলে সংগঠনের নিয়মতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতা বাধাগ্রস্ত হয়। তথাপিও ব্যক্তিগতভাবে শায়খুল হিন্দ রহ. তার শিষ্যদের মনস্তত্ত ও চিন্তাচেতনার পরিগঠনের মাধ্যমে কমবেশি ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এ সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ বহাল রাখেন।[illegible]

সিন্ধুতে আজাদি আন্দোলন

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষানবিশরা দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষার্জন করতে আসত। তারা শায়খুল হিন্দ রহ.-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হতো এবং মুবাল্লিগ হয়ে যখন নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেত, সেখানে মাদরাস ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন-সংগ্রামকে গতিশীল করতে থাকত। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩১৫ হিজরি সনে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষে কর্মজীবনের সূচনায় শায়খুল হিন্দ রহ.-এর তত্ত্বাবধানে সিন্ধুতে দারুর রাশাদ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

[illegible]. আসিরানে মাল্টা : ১২
[illegible]. আসিরানে মাল্টা : ২৩

তৎকালে সিন্ধুতে হিন্দুস্তানের আজাদির জন্য একটি গোপন আন্দোলন চালু ছিল; যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বর্ষীয়ান বুজুর্গ গোলাম মুহাম্মদ দ্বীনপুরি রহ.। তিনি ছিলেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ.-এর পির ও মুরশিদ। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. শায়খুল হিন্দ রহ. এবং দিল্লিতে গোলাম মুহাম্মদ দ্বীনপুরি রহ.-এর নেতৃত্বে চলমান আন্দোলনের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেন। এমনকি একপর্যায়ে উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. শায়খুল হিন্দ রহ.-কে সিন্ধুতে নিয়ে আসেন এবং এখানকার কাজকর্মের সাথে তাকে পরিচিত করান।

এভাবে সিন্ধুসহ বিভিন্ন অঞ্চলে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর শিষ্যবৃন্দ দ্বীনি খেদমতের শিরোনাম দিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং সাধারণ ও বিশেষ সর্বস্তরের লোকদের মানসগঠনের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন।

জমিয়তুল আনসার

সামারাতুত তরবিয়তের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শায়খুল হিন্দ রহ. নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৩২৭ হিজরি সনে জমিয়তুল আনসার গড়ে তোলেন। এ সংগঠন পরিচালনার জন্য মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ.-কে সিন্ধু থেকে দেওবন্দে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তার হাতে যাবতীয় কাজকর্ম বুঝিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. লিখেছেন, '১৩২৭ হিজরি (১৯০৯) সনে শায়খুল হিন্দ রহ. আমাকে দেওবন্দে ডেকে পাঠান। সব কিছু শুনে তিনি আমাকে দেওবন্দে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এর পাশাপাশি দেওবন্দের সাথে সম্পর্কও অটল থাকবে।'[৮৫]

জমিয়তুল আনসারকে জনসাধারণের মাঝে পরিচিত করার জন্য কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯১১ সনে দারুল উলুম দেওবন্দের এক আজিমুশশান দস্তারবন্দি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; যাতে ত্রিশ হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন;[৮৬] যা ছিল অবিস্মরণীয় এবং দারুল উলুম দেবওবন্দের গ্রহণযোগ্যতার অনেক বড় প্রমাণ। এ সম্মেলনে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সাথে চিন্তাগত সামঞ্জস্য রাখেন এমন হাজার হাজার আলেমেরও সমবেত হওয়ার সুযোগ মেলে। এমনকি সিন্ধুতে চলমান আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী খাজা গোলাম মুহাম্মদ দ্বীনপুরি ও মাওলানা তাজ মুহাম্মদ আমরুতি রহ.-ও এ সুযোগে দেওবন্দ আগমন করেন।

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে জমিয়তুল আনসারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ও সাধারণ সকলের নিকট তুলে ধরা হয়। সেই থেকে এর আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

---

৮৫. জাতি ডায়েরি : ২০
৮৬. উলামায়ে হক : ১/১৩

জমিয়তুল আনসারের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক সম্মেলন ১৯১১ সনে মুরাদাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে দেওবন্দের আলেমগণ ছাড়াও আলিগড় ও নদওয়াতুল উলামার আলেমগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯১২ সনে মিরাঠায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ.। তৃতীয় সম্মেলন ১৯১৩ সনে শিমলায় অনুষ্ঠিত হয়।[৮৭]

এভাবে ক্রমশ জমিয়তুল আনসারের গ্রহণযোগ্যতা ও আয়তন প্রসারিত হতে থাকলে ব্রিটিশ সরকারের চোখে পড়ে। আশঙ্কা ছিল, জমিয়তুল আনসারের আড়ালে দারুল উলুম দেওবন্দ ব্রিটিশদের নিশানায় পড়ে যায় কিনা। এজন্য শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নির্দেশে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. জমিয়তুল আনসারের দায়িত্ব ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে এ সংগঠন ও তার সার্বিক কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে।

নাজারাতুল মাআরিফ দিল্লি

জমিয়তুল আনসার থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. দেওবন্দ ছেড়ে দিল্লি চলে যান। এখানে এসে তিনি ফাতাহপুর মসজিদে নাজারাতুল মাআরিফ আল-কুরআনিয়া নামে একটি চিন্তাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন; যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শায়খুল হিন্দ রহ., নবাব ওকারুল মুলক ও হাকিম আজমল খান।[৮৮]

নাজারাতুল মাআরিফ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ ও সাধারণ সকল শ্রেণির লোকদের চিন্তাধারা ও মানসগঠন। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া রহ. বলেন, 'এ প্রতিষ্ঠান ছিল সংকটাপন্ন স্বাধীনতার নিরাপদ আশ্রয় ও মুক্তিকামী সৈনিকদের পরামর্শকেন্দ্র।'[৮৯] মাওলানা মুহাম্মদ আলি জওহর ও মাওলানা আবদুল কালাম আজাদের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় বড় নেতার সঙ্গে এখানে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. এর চেনা পরিচয় হয়।[৯০]

প্রায় দুই বছর পর্যন্ত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. দিল্লিতে অবস্থান করে এ সংগঠন পরিচালনা করেন।[৯১]

শায়খুল হিন্দ রহ. তখনও ব্যক্তিগঠনের কাজ নিরলসভাবে করতে থাকেন এবং তার শিষ্যবৃন্দ নিজ নিজ অঞ্চলে দ্বীনি মারকাজ প্রতিষ্ঠা করে নানামুখী কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে থাকেন। পরিকল্পনাটা এমন ছিল যে,

---

৮৭. মাকামে মাহমুদ : ২০৩
৮৮. নকশে হায়াত : ২/১৪৫
৮৯. আসিরানে মাল্টা : ২৭
৯০. উলামায়ে হক : ১/১৩৬
৯১. উলামায়ে হক : ১/১৩৬

ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করে আন্দোলনের নতুন কমসূচি গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ১৯১৪ সালে যখন জার্মান ও ব্রিটিশের মাঝে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, হিন্দুস্তানসহ গোটা বিশ্বের পরিস্থিতি আমূল পালটে যায়। তখন শায়খুল হিন্দ রহ.-সহ আলেমসমাজ উপলব্ধি করেন, ব্রিটিশদের পরাস্ত করার এটিই মোক্ষম সুযোগ।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রথমে ইয়াগিস্তান অধীনস্থ বাজুর জেলার জিগি নামক এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর শিষ্য ও অনুসারীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক জিহাদ শুরু করে। আর এ সব কিছু পরিচালিত হচ্ছিল সরাসরি শায়খুল হিন্দ রহ. এর প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও পরামর্শে।

এই জিহাদের নেতৃত্ব ছিল শায়খুল হিন্দ রহ.-এর দুই বিশেষ অনুরাগী হাজি সাহেব তারাংজি এবং মাওলানা সাইফুর রহমান কাবেলির হাতে।

এ সময় পুরো রাষ্ট্রজুড়ে আন্দোলনের নতুন নতুন ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়। এরমধ্যে দেওবন্দ, দিল্লি, পানিপথ, চকওয়াল, দ্বীনপুর, আমরুট, করাচি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব জায়গা থেকে মুজাহিদদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা আসছিল। এ ছাড়া স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতাও পর্যাপ্ত ছিল।

বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

প্রথমদিকে জিহাদ বেশ সফলতার সাথেই পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় রসদের স্বল্পতা এবং ইংরেজ দালালদের বিরুদ্ধাচারণমূলক প্রোপাগান্ডার কারণে জিহাদ বাধাগ্রস্ত হতে থাকে।

ইংরেজদের গৃহপালিত দালালরা সে সমস্ত এলাকায় গিয়ে প্রচার-প্রসার করতে লাগল যে, এই জিহাদ কোনো আমির ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে, তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না। তোমাদের আমির হচ্ছেন আফগানিস্তানের গভর্নর হাবিবুল্লাহ। তিনি যখন জিহাদের নির্দেশ দেবেন তখন জিহাদ হবে।

এমনতর পরিস্থিতিতে আজাদি আন্দোলনের প্রধান সিপাহসালার শায়খুল হিন্দ রহ. উপলব্ধি করলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাইরের রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। ফলে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ.-কে প্রথমে তহবিল গঠনের জন্য আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে প্রেরণ করেন। স্বয়ং শায়খুল হিন্দ রহ. তার কয়েকজন বিশেষ অনুরাগীকে নিয়ে

. আসিরানে মাল্টা : ২৭
. মাকামে মাহমুদ : ২৮১
. মাকামে মাহমুদ : ২৮১
. নকশে হায়াত : ২/১৮১
. নকশে হায়াত : ২/১৮৫
. নকশে হায়াত : ২/১৮৫

হেজাজ ভ্রমণ করেন; যেন উসমানি খেলাফত (যাকে তৎকালে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল জ্ঞান করা হতো) থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে শলাপরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করা যায়।

হেজাজের পথে শায়খুল হিন্দ রহ.

১৯১৫ সনের ৯ অক্টোবর শায়খুল হিন্দ রহ. মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেন। সেখানকার তুর্কি গভর্নর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার নিকট হিন্দুস্তানের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

সব কিছু শুনে গালিব পাশা তার পক্ষ থেকে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের নিকট একটি পত্র লিখে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর হাতে অর্পণ করেন; যাতে মুসলমানদের জালেম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান ছিল। পত্রটি গালিবনামা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

শায়খুল হিন্দ রহ. স্বয়ং গালিব পাশার এই পত্র ইস্তাম্বুল হয়ে পাকিস্তান নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ইরাকে ব্রিটিশদের আক্রমণের কারণে রাস্তা নিরাপদ ছিল না বিধায় গালিব পাশা তাকে এ পথ ধরে পাকিস্তান না যেতে অনুরোধ করলেন। তার কথামতো শায়খুল হিন্দ রহ. যাত্রাবিরতি করলেন। এবার তিনি কাঠের সাহায্যে একটি বাক্স তৈরি করে এর দুই তক্তার নিচে গোপন জায়গায় গালিবনামা রাখলেন। অতঃপর মুজাফফারনগর জেলার খানজাহানপুরের রঈস সাইয়েদ হাদির হাতে বাক্সটি দিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া মানসুর আনসারি রহ.-এর হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া আনসারিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন সুচারুরূপে গালিবনামা রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী ইংরেজদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রচার-প্রসার করেন। সেমতে তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দেন এবং ইংরেজদের অতিসতর্কতা ও তল্লাশি সত্ত্বেও গালিবনামা সেসব অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেন।

গালিবনামার ভাষ্য

মক্কায় নিযুক্ত উসমানি খেলাফতের গভর্নর জনাব গালিব পাশার পক্ষ থেকে লেখিত ঐতিহাসিক গালিবনামার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ–

> বিশ্বজাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর রাসুলের খলিফা উসমানি খেলাফতের মনোনীত হেজাজের গভর্নর গালিব পাশার পক্ষ থেকে।

. নকশে হায়াত : ২/১৮৬
. আসিরানে মাল্টা : ৩৮
. আসিরানে মাল্টা : ৩৮
. আসিরানে মাল্টা : ৩৯
. নকশে হায়াত : ২/২২২

পর সমাচার! এই কথা আজ কারও নিকট গোপন নয় যে, বিগত এক বছর তুর্কির ইসলামি হুকুমত শত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে। রুশ, ফ্রান্স ও ইংরেজ রাষ্ট্রসমূহ উসমানি সালতানাতের ওপর ক্রমাগত স্থল ও সামুদ্রিক অভিযান চালিয়ে আসছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমিরুল মুমিনিন ও খলিফাতুল মুসলিমিন একমাত্র মহান আল্লাহর সাহায্য, সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহানি শক্তির ওপর ভরসা করে জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন; যার ডাকে সাড়া দিয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমান সম্প্রদায় লাব্বাইক বলেছেন এবং সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহর শোকর, তুর্কি মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা শত্রু বাহিনীর সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশি। তারা শত্রুদের সত্তাগত ও নৈতিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। রুশ বাহিনীর বিরাট একটি অংশকে তারা নাস্তানাবুদ করেছে। বিভিন্ন স্থানে এক লক্ষ ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্য হত্যা এবং সামরিক সরঞ্জামাদিসহ তাদের একাধিক যুদ্ধ জাহাজ বিধ্বস্ত করা হয়েছে। তুর্কি, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা পূর্বে রুশ এবং পশ্চিমে ফরাসি সৈন্যদের পুরোদমে পর্যুদস্ত করেছে। এক-তৃতীয়াংশ রুশ ও ফরাসি এলাকা, গোটা বেলজিয়াম দখল, লাখ লাখ রাইফেল, বন্দুক ও অন্যান্য সামগ্রী যুদ্ধ করে কব্জা করে নিয়েছে এবং কয়েক হাজার সেনাকে বন্দি করেছে। এখন বুলগেরিয়াও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং তারা সার্বিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

তাই মুসলমানদের মধ্যে যারা সে সকল রাষ্ট্রের দাসত্ব করছে তাদের আমার এই পয়গাম পৌঁছে দিন যে, তারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে। এখন তারা অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা মুসলমানদের সামনে যে শক্তি ও সামর্থ্য জাহির করে তা নিছক কল্পনা বই কিছু নয়।

হে মুসলিম জাতি! আজ তোমাদের মুক্তির দিন। এজন্য নিজেদের দুর্দশা, লাঞ্ছনা, অপদস্থতা এবং অন্যের দাসত্বে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়ো না। নিঃসন্দেহে আজাদি, বিজয় ও সাহায্য তোমাদের সাথে রয়েছে। আলস্যের নিদ্রা ছেড়ে জাগ্রত হও এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও একতা গড়ে তোলো। নিজেদের কাতার সঠিক করে নাও। অতঃপর প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত আসবাবপত্র জোগাড় করে সেই জালেম ও নিপীড়ক খ্রিষ্টান রাজত্বের বিরুদ্ধে জেগে ওঠো, যার দাসত্বের দুর্বল রশি তোমাদের গলায় বাঁধা হয়েছে। গোলামির জিঞ্জিরকে নিজেদের নীতি-আদর্শ, সাহস ও ধর্মের তেজস্ক্রিয় দ্বারা কেটে ফেলে দাও এবং এভাবে নিজেদের অস্তিত্ব ও মানবিক অধিকার অর্জন করো। আমরা ইনশাল্লাহ অচিরেই পরিপূর্ণ বিজয় ও সফলতার পর পরস্পরে অঙ্গীকারাবদ্ধ হব। তখন তোমাদের সমস্ত অধিকার পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করব। তার আগে এখন তোমরা দ্রুত দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দুশমনের গলা কেটে তাদের মৃত্যুমুখে পৌঁছে দাও। তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করো। আমরা তোমাদের দিকে ভরসা ও নির্ভরতার দৃষ্টি রাখছি। এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া হতে দিয়ো না।

তোমাদের এ কথাও জেনে রাখা উচিত, মাওলানা মাহমুদ হাসান–যিনি প্রথমে হিন্দুস্তানের দেওবন্দ মাদরাসায় ছিলেন, তিনি আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং আমাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে আমরা তার সঙ্গে একতাবদ্ধ এবং এ ব্যাপারে আমরা তাকে জরুরি দিকনির্দেশনা

দিয়েছি। তোমরা তার ওপর ভরসা রাখো। তিনি যদি তোমাদের নিকট আসেন তাহলে তোমরা তাকে জান-মাল এবং প্রয়োজনীয় সকল কিছু দিয়ে সাহায্য করবে।[১০৩]

গালিবনামার প্রচার-প্রসার ও এর প্রভাব

গালিব পাশার এই পত্র হিন্দুস্তানের সীমান্তবর্তী আজাদ অঞ্চলসমূহে প্রচার-প্রসারের পর জনসাধারণের মাঝে জিহাদের সীমাহীন জোশ ও জজবা তৈরি হয়। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া মানসুর আনসারি রহ.–যিনি গালিবনামা আজাদ অঞ্চলসমূহে পৌঁছে দিয়েছেন–তিনি একটি পত্র মারফত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে বলেন, 'গালিবনামা হিন্দুস্তানের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের মাঝে প্রচার-প্রসারের পর ইয়াগিস্তানের নেতৃবৃন্দের কাছে নিয়ে যাই। হাজি সাহেব এখন মেহমেন্দে অবস্থান করছেন। মুহাজিরগণ মেহমেন্দ, বাজোড়, সোয়াত, বিজ প্রভৃত অঞ্চলসমূহে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। এ সমস্ত এলাকায় গালিবনামা বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। পূর্ব থেকেই ইয়াগিস্তানে জিহাদের পূর্ণ পরিবেশ তৈরি ছিল। এখানকার নারী-পরুষ ও উলামা-মাশায়েখ-নির্বিশেষে সকলে প্রস্তুত ছিলেন যে, সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবস্থা হলেই তারা তাদের কওমের সাথে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'[১০৪] শুধু তাই নয়, তারা তাদের অবস্থার বিবরণ তুলে ধরে একটি আবেদনপত্রও প্রস্তুত করে, যা শায়খুল হিন্দ রহ.-এর মধ্যস্থতায় তৎকালীন খলিফা সুলতান মুহাম্মদ (পঞ্চম)-এর নিকট প্রেরণ করবে ভেবেছিল। কিন্তু পরে আর তা পাঠানো সম্ভব হয়নি। ইংরেজ বাহিনী তা হস্তগত করে ফেলে।

ইয়াগিস্তানের মুহাজির ও আনসারদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জমিয়তে হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে পত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাতে উল্লেখ করা হয়, এ সংগঠন শায়খুল হিন্দ রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবেদন পত্রটি ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছিল। এর অনুবাদ নিম্নরূপ–

মানবজাতির সেবক, ইসলামের রক্ষক, আলেমকুলের বাদশাহ, আল্লাহর পথের মুহাজির জমিয়তে হিজবুল্লাহর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাওলানা মাহমুদ হাসানের মধ্যস্থতায় গাউসুল ইসলাম, খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন খাদেমুল হারামাইনিশ শরিফাইন সুলতান ইবনে সুলতান মুহাম্মদ (পঞ্চম)-এর নিকট।

আদব ও সালামের পর অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আপনার খেদমতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি তুলে ধরছি–

এক. আমরা ইসলামের খাদেম, আলেমদের বাদশাহ মাওলানা মাহমুদ হাসানের তত্ত্বাবধানে সমবেত হয়েছি। আমরা নিজেদের নাম রেখেছি হিজবুল্লাহ। জুলুম-নিপীড়নের আগুন নির্বাপিত করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

---

১০৩. তাহরিকে শায়খুল হিন্দ (রহ.) : ২৮৩
১০৪. তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ২৭০

দুই. হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত অঞ্চল যা ওয়াজিরিস্তান থেকে কাশ্মির পর্যন্ত বিস্তৃত; তাকে আজাদ অঞ্চল বলা হয়। বাহাদুর ও সাহসী আফগান জাতির বসবাস এখানে, যারা শুরু থেকেই নিজেদের অঞ্চলকে ইংরেজদের শাসন ও আধিপত্য থেকে আজাদ রেখেছে। আমরা ইসলামের সেবকগণ ১৩৩১ হিজরি সনে মেহমেন্দ থেকে কাশ্মির পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে নিজেদের কেন্দ্র ও ক্যাম্প স্থাপন করে রেখেছি, যেখান থেকে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা নিসলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছি।

তিন. খেলাফতের কেন্দ্রস্থল থেকে যখনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তখনই জমিয়তে হিজবুল্লাহর একদল সদস্য আলেম সমাজের নেতা মাহমুদ হাসানের ইশারায় ইংরেজ হুকুমত থেকে হিজরত করে আজাদ অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে এবং এখানকার লোকদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করার কুশেশ শুরু করে। বিগত বছরে ব্রিটিশ সরকার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে আমাদের এ আন্দোলন-সংগ্রামের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তানের আন্দোলনেও আমরা ভরপুর চেষ্টা চালিয়েছি এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছি। যদিও আজ পর্যন্ত তেমন কোনো সফলতা অর্জন হয়নি।

চার. ইংরেজদের মোকাবিলা করার বাহ্যিক শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে আরজ করছি–

ক. বিভিন্ন হুকুমতের সাথে সন্ধি স্থাপন এবং চুক্তি সম্পাদনের সময় আমাদের উপরিউক্ত আজাদ অঞ্চলকে সংরক্ষণ ও অবিচল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক, যেন এ অঞ্চল ইংরেজদের আধিপত্য থেকে মুক্ত থাকে এবং একসময় তা খেলাফতের অধীনস্থ হয়ে যায়।

খ. এ অঞ্চলের পরিচালনা ও উন্নতি-অগ্রগতির জন্য খেলাফতের পক্ষ থেকে অফিসার নিয়োগ দেওয়া হোক।

গ. চলমান যুদ্ধের মাঝেই যদি কিছু অফিসারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য যুদ্ধ-সামগ্রীসহ প্রেরণ করা হয় তাহলে এখানকার লাখ লাখ জানবাজ মুজাহিদ বিনা বেতনে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের বেশি থেকে বেশি খেলাফতের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করুন।

১৭ শাওয়াল ১৩৩৫ হিজরী (আনুমানিক ১৫ আগস্ট ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

পত্রের নিচে জমিয়তে হিজবুল্লাহর সভাপতি জনাব হাজি সাহেব তারাংজি, আনসার জমিয়তে হিজবুল্লাহর প্রধান মোল্লা সাহেব হাবরা, জমিয়তে হিজবুল্লাহর মুহাজির সদস্য মৌলবি ফজলে রাব্বি ও মৌলবি আবদুল আজিজের সিলমোহর যুক্ত করা হয়।[১০৫]

উপর্যুক্ত পত্র পাঠের পর এ কথা খুব ভালো করে বুঝে আসে যে, আজাদ অঞ্চলে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আন্দোলন পরিপূর্ণ জমে উঠেছিল। তিনি তার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে জিহাদের প্রস্তুতি আঞ্জাম দিয়েছেন। পরিশেষে বাহ্যিক

[১০৫]. তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ২৮১

সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি পালটে যাওয়ায় অনন্যোপায় হয়ে উসমানি খেলাফতের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান।

কাবুলে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধির কার্যক্রম

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি ও তার সঙ্গীরা কাবুলে গিয়ে কূটনৈতিকভাবে আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এক হচ্ছে, হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে যারা আফগানিস্তান এসেছেন তাদের নিয়ে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেন, যা প্রবাসী ভারত সরকার নামে প্রসিদ্ধ। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. তাতে যোগদান করেন এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মহারাজা প্রতাব সিং হন এর রাষ্ট্রপতি। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি ও বরকতুল্লাহ ভোপালিকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য মনোনীত করা হয়।[১০৬] দ্বিতীয়ত, জুনুদে রব্বানিয়া নামে একটি বাহিনী গঠন করেন, যার প্রধান কেন্দ্র মদিনা মুনাওয়ারা এবং প্রধান সিপাহসালার শায়খুল হিন্দ রহ.-কে মনোনীত করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া মানসুর আনসারি রহ. শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নিকট প্রেরিত একটি পত্রে লেখেন–

হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত আজাদি আন্দোলনের সৈনিকদের নেতৃত্বে কাবুলে একটি অস্থায়ী হিন্দুস্তানি হুকুমত (প্রবাসী ভারত সরকার) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি ও মৌলবি বরকতুল্লাহ এই সরকারের মন্ত্রী। তারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্র ও অন্যান্য লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রাথমিকভাবে তাতে সফলও হয়েছেন। এ কাজের বড় একটি অংশ হচ্ছে ছাত্রসমাজ। তাদের কয়েকজন উসমানি খেলাফতের কেন্দ্র হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

জুনুদে রাব্বানিয়া নামে গঠিত দলটি নিরেট ইসলামি একটি দল। তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকদের মাঝে জনমত, আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা। এর প্রধান–যাকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে জেনারেল অথবা কায়েদ বলা হয়–শায়খুল হিন্দ রহ.-কে নিযুক্ত করা হয় এবং এর সদর দফতর স্থাপন করা হয় মদিনা মুনাওয়ারায়।[১০৭]

পালটে গেল যুদ্ধের চিত্র

যে সময় গালিব পাশা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের নিকট পত্র মারফত পয়গাম প্রেরণ করেন, তখন বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি ও জার্মানি ফন্ট বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিল। যেমনটি গালিবানামায় বিস্তারিত বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময় আমেরিকা

[১০৬]. মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ.-কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাওলানা বরকতুল্লাহ ভোপালিকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।

[১০৭]. তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ২৭১

যখন ব্রিটেন ও রোশ বাহিনীকে পর্যাপ্ত সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করল, অপরদিকে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে শরিফ মক্কায় তুর্কি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, তখন বিশ্বযুদ্ধের চিত্র আমূল পালটে গেল এবং তুর্কি ও জার্মান ফন্টের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো। বিশেষভাবে আরব অঞ্চলসমূহে তুর্কি বাহিনী মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো।

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আজাদি আন্দোলন উসমানি খেলাফত ও তার মিত্রশক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই এ জোট পরাজিত হলে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আন্দোলনের সফলতার বাহ্যিক রাস্তাও আপাতত বন্ধ হয়ে গেল।

আন্দোলনের গোপনীয়তা ফাঁস

সার্বিক খবরাখবর তো ইংরেজদের নলেজে ছিলই। আর এজন্যই তো শায়খুল হিন্দ রহ. যখন হেজাজে পাড়ি জমাচ্ছিলেন, তখন ইংরেজ বাহিনী তাকে গ্রেফতারের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল; কিন্তু তিনি কখন কোথায় কী করছেন এসবের বিস্তারিত তথ্য তাদের কাছে ছিল না। ফলে তিনি নির্বিঘ্নে হেজাজ পাড়ি জমাতে সক্ষম হন।

শায়খুল হিন্দ রহ. আন্দোলনের যাবতীয় কার্যক্রম আন্দোলনের সফলতার স্বার্থেই গোপনভাবে পরিচালনা করছিলেন। তিনি যথাসম্ভব তার প্রতিটি পদক্ষেপ অন্যদের থেকে গোপন রাখছিলেন।[১০০]

তথাপিও ইংরেজ সরকার এসব জেনে যাচ্ছিল। ঘটনার শুরুটা হয় এভাবে–মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন যে, হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরে আজাদি আন্দোলনের যে সকল কার্যক্রম এখন পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো বিস্তারিত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরি। তাহলে এ ক্ষেত্রে তার মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ এবং সামনে তা বাস্তবায়ন করা যাবে। ফলে আন্দোলন আরও বেগবান ও ফলপ্রসূ হবে। সেমতে উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. আন্দোলনের সার্বিক কার্যক্রম একটি রেশমি রুমালে লিপিবদ্ধ করলেন। এ ছাড়া অন্য একটি পত্র লিখলেন মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া মানুসর আনসারি রহ.; যাতে কাবুলে গঠিত অস্থায়ী ভারত সরকার ও জুনুদে রাব্বানিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ছিল এবং তাতে রাষ্ট্রজুড়ে আন্দোলন-সংগ্রামে জড়িত সকল ব্যক্তির নাম তাদের পদবিসহ উল্লেখ ছিল। সেই সাথে উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ.-এর আরেকটি পত্র মাওলানা আবদুর রহিম সিন্ধির নামে ছিল; যেখানে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, তিনি যেন এসব পত্র যথাযথ সংরক্ষণের সাথে মদিনায় পৌঁছে দেন। উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. এ তিনটি পত্র একত্রে আবদুল হক নামের এক নওমুসলিম ব্যক্তিকে দিলেন মাওলানা আবদুর রহিম সিন্ধির নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বিপত্তি বাঁধল অন্য জায়গায়।

[১০০]. তাহরিকে শায়খুল হিন্দ : ১২৬

যে নওমুসলিককে পত্র তিনটি পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে তা কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় না পৌঁছে দিয়ে ইংরেজ বাহিনীর চাটুকার ও দালাল এক সাবেক সেনার হাতে তুলে দেয়। সে নিয়ে এগুলো মুলতানের কমান্ডারকে হস্তান্তর করে। অতঃপর তার হাত হয়ে পত্রগুলো ইংরেজ গোয়েন্দাদের হস্তগত হয়। তারা পত্র তিনটির মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নাড়িনক্ষত্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়ে যায় ব্রিটিশ সরকার। সে অনুযায়ী তারা প্রত্যেক এলাকায় স্বাধীনতাকামী সৈনিকদের কঠিনভাবে ধরপাকড় শুরু করে।[১০১]

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর অবস্থান

পত্রগুলো যখন পাঠানো হয়, তখন শায়খুল হিন্দ রহ. নিজ সঙ্গীদের সাথে তায়েফে অবরুদ্ধ ছিলেন। কারণ, শরিফ মক্কার তুর্কি হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইংরেজদের হয়ে সে তুর্কি হুকুমতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

প্রথমত শায়খুল হিন্দ রহ. তুর্কি মন্ত্রী আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার সাথে সাক্ষাতের জন্য মদিনা যান। সেখানে তিনি তাদের থেকে আজাদি আন্দোলনের পক্ষে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করেন। তারপর মদিনা থেকে তিনি দ্রুত ইরানের পথ ধরে ইয়াগিস্তান আসার সংকল্প করেন। তবে ফিরে আসার পূর্বে তিনি মক্কার গভর্নর গালিব পাশার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মক্কা যান। আর গালিব পাশা তখন অত্যধিক গরম আবহাওয়ার কারণে তায়েফে অবস্থান করছিলেন। মক্কার তুলনায় তায়েফের আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। তাই গালিব পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শায়খুল হিন্দ রহ.-কে তায়েফ যেতে হয়। কিন্তু তায়েফে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে শরিফ ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায় মক্কায় বিদ্রোহ করে। পরিস্থিতি দ্রুত ঘোলাটে হয়ে যায়। পথঘাট অনিরাপদ হয়ে পড়ে। ফলে শায়খুল হিন্দ রহ. উপায়ান্তর না দেখে প্রায় আড়াই মাস তায়েফেই অবস্থান করেন। পরিশেষে ২০ রজব ১৩৩৪ হিজরিতে মক্কা থেকে রওনা করেন।

শায়খুল হিন্দ রহ. দ্রুত ইয়াগিস্তানে পৌঁছাতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু তখন যেহেতু হজের সময় নিকটবর্তী ছিল, তাই তায়েফের অবরোধ থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে মক্কায় আসেন। এখানে পবিত্র হজ পালন করে তারপর সফর শুরু করেন।[১০২]

শায়খুল হিন্দ ও তার সঙ্গীদের বন্দিত্ব

হিন্দুস্তানের এক সরকারি কর্মকর্তা খান বাহাদুর মুবারক আলি (আওরঙ্গবাদী) সে সময় মক্কায় যান। তিনি শরিফের সাথে সাক্ষাৎ করে তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন যে, হারামের আলেমদের পক্ষ থেকে

[১০১]. মাকামে মাহমুদ : ২৯৭
[১০২]. আসিরানে মাল্টা : ৪২

এমন একটি ফাতওয়া জারি হোক, যাতে তুর্কিদের কাফের ঘোষণা করা হবে এবং সেই ফাতওয়া হিন্দুস্তানে ইংরেজ শাসনের পক্ষে প্রচার-প্রসার করা হবে। সেমতে শরিফ এমন একটি ফাতওয়া প্রস্তুত করে হারামে অবস্থিত আলেমদের নিকট স্বাক্ষরের জন্য পাঠায়। একপর্যায়ে ফাতওয়াটি শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি এই ফাতওয়ার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান।

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সামনে এই ফাতওয়া পেশ করা হয় ১৩৩৫ হিজরির মহররম মাসের শেষ দিকে। ফাতওয়ায় স্বাক্ষর না করায় শায়খুল হিন্দ রহ. ও তার সঙ্গীদের গ্রেফতার হওয়ার শঙ্কা ছিল। এজন্য তিনি দ্রুত শরিফের নাগাল থেকে বের হয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু মক্কা থেকে রওনা করার আগেই শরিফ তাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।

গ্রেফতার এড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টাই করা হয়েছিল। শায়খুল হিন্দ রহ.-এর বিশেষ অনুরাগী সাইয়েদ আমিন আসেম ও দিল্লির প্রভাবশালী অনেক ব্যবসায়ী মক্কার শায়খুল ইসলাম মুফতি আবদুল্লাহ সিরাজ রহ.-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। বারবার আলাপ ও সংলাপের পর একপর্যায়ে তিনি ক্ষমা করতে সম্মতও হয়েছেন। কিন্তু সকল কর্তৃত্ব যার হাতে ছিল সেই শরিফ কিছুতেই রাজি হয়নি। সে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, 'ইংরেজদের সাথে মাত্রই আমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাই এখন তাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা যাবে না।'

সর্বপ্রথম শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি নিজেই এর বর্ণনা দিয়ে বলেন–

> আমাকে হামিদিয়ায় ডেকে পাঠানো হয়। পুলিশ কমান্ডার আমাকে বলে, তুই ইংরেজ হুকুমতকে মন্দ বলিস, এখন তার মজা ভোগ কর! তারপর আমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-কে মক্কার একটি উন্নত কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। এখানে কয়েদিদের পোশাক ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয় না এবং তাদের কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া হয় না। সেখানে বাহির থেকে খানা চেয়ে আনার অনুমতিও ছিল।

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আত্মগোপন

গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর শায়খুল হিন্দ রহ. তার সঙ্গী ও ভক্ত-অনুরাগীদের পরামর্শে মাওলানা ওয়াহিদ আহমদের সাথে আত্মগোপনে চলে

[illegible]. সফরনামায়ে আসিরে মাল্টা : ৩৩
[illegible]. আসিরানে মাল্টা : ৩৪
[illegible]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৩৭
[illegible]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৩৯
[illegible]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৩৯

যান। মক্কার বিদ্রোহী নেতা শরিফের পুলিশ বাহিনী পর্যাপ্ত খোঁজাখুজির পরও তাদের নাগাল পায়নি। সারাদিন হন্য হয়ে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে যখন সন্ধ্যায় শরিফকে এই সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, যদি এশার আগে মাওলানা সামনে না আসে, তাহলে তার দুই সাথি মাওলানা উজায়ের গুল ও হাকিম নুসরত হুসাইনকে গুলি করে হত্যা করা হবে এবং তার আশ্রয়দানকারী সাইয়েদ আমিন আসেমকে একশ দুররা মেরে তার থেকে ব্যাবসায়িক লাইসেন্স ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সংবাদ শুনে শায়খুল হিন্দ রহ. আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসেন।

বেরিয়ে আসার পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং উটের ওপর সওয়ার করে তৎক্ষণাৎ জেদ্দা পাঠিয়ে দেয়। মক্কা থেকে যখন তিনি জেদ্দা যাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আমি মসিবতে পতিত হয়েছি, কোনো মাসিয়তে (অন্যায় ও পাপ কাজে) লিপ্ত হইনি।'

২৩ সফর ১৩৩৫ হিজরিতে শায়খুল হিন্দ রহ.-কে মক্কা থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৪ সফর তাকে নিয়ে পুলিশ জেদ্দা পৌঁছে।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মাওলানা ওয়াহিদ আহমদ ফয়েজাবাদী, মাওলানা উজায়ের গুল ও হাকিম সাইয়েদ নুসরত হুসাইন। শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. তখন মক্কায় জেলবন্দি ছিলেন।

উস্তাদের খেদমতে মাদানি রহ.

শায়খুল ইসলাম মাদানি রহ. চাইলে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্কের মাধ্যমে জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় চলে যেতে পারতেন এবং পূর্বের মতো নিয়মতান্ত্রিকভাবে মসজিদে নববিতে হাদিসের পাঠদান ও তালিমি খেদমতে নিয়োজিত হতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি তার উস্তাদ শায়খুল হিন্দ রহ.-এর খেদমতে যে আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ইতিহাসে বিরল এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাযোগ্য। শায়খুল ইসলাম যখন জানতে পারলেন, তার উস্তাদ শায়খুল হিন্দ রহ.-কে গ্রেফতার করে জেদ্দায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি মক্কার জেলখানা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে জেদ্দায় স্বীয় উস্তাদের নিকট চলে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা শুরু করেন। সাইয়েদ মুহাম্মদ আহমদ জাফরিকে বললেন, 'আমি যেহেতু মদিনা মুনাওয়ারা থেকে শুধু মাওলানার খেদমত করার জন্য বেরিয়েছি, তাই আমাকে তার খেদমতে থাকা জরুরি। মাওলানা যদি জেদ্দা থেকে হিন্দুস্তান চলে যান তাহলে আমাকে তার সঙ্গে থাকা জরুরি নয়। কেননা, ওখানে খেদমত করার মতো তার অনেক

[illegible]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৪৪
[illegible]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৪১

বড় বড় খাদেম রয়েছেন। আর যদি হিন্দুস্তান না পাঠিয়ে অন্য কোথাও পাঠানো হয়, তাহলে অবশ্যই আমাকে তার সঙ্গে থাকতে হবে। তাই যেভাবেই হোক আমাকে মাওলানার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।'

শায়খুল ইসলামের অনুরোধে সাইয়েদ আহমদ জাফরি প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। অবশেষে সফর মাসের ২৩ তারিখ তাকে মক্কার জেল থেকে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নিকট জেদ্দায় প্রেরণ করা হয়।[118]

জেদ্দা থেকে মিশরের পথে

শায়খুল হিন্দ রহ. এবং তার ভক্ত-অনুরাগীরা চাইতেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের যেন জেদ্দা অথবা এর আশপাশের কোনো জেলখানায় রাখা হয়। কিন্তু ইংরেজ জেনারেল দিলসান তাতে সাড়া দেননি; বরং সকল বন্দিকে মিশর পাঠানোর নির্দেশ দেন।[119]

১৮ রবিউল আওয়াল ১৩৩৫ হিজরি মোতাবেক ১২ জানুয়ারি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে জুমার দিন তাদের ইঞ্জিন চালিত নৌকায় চড়িয়ে মিশরে পাঠানো হয়। পাঁচ দিন টানা চলার পর নৌকা কায়রোয় পৌঁছে। সেখান থেকে মিশরের রাজনৈতিক জেলখানা জিজায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রথমে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক অত্যন্ত কঠোরতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপর সকলকে আলাদা আলাদা জমঘরে (যে ঘরে ফাঁসি দেওয়া হয়) আটকে রাখে। ফলে তারা ভাবেন, তাদের সকলকে বুঝি ব্রিটিশ সরকার ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে। এজন্য শায়খুল হিন্দ রহ. সবচেয়ে বেশি তার সাথিদের নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি ভাবতে থাকেন, আমার কারণে তাদের সকলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সকলে কাছাকাছি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এবং ইংরেজ প্রশাসন যথাসম্ভব চেষ্টা করেও এমন কোনো তথ্য পায়নি যার ভিত্তিতে তাদের ফাঁসি হতে পারে। বয়ান অনুলিপিকারী অফিসার বারবার বলছিলেন, তোমাদের ব্যাপারে আমাদের কাগজপত্রে তো ফাঁসির কথা রয়েছে কিন্তু তোমরা তো তেমন কিছু স্বীকার করোনি, যার ভিত্তিতে তোমাদের ফাঁসি দেওয়া যায়।[120]

প্রায় এক সপ্তাহ সকলে পৃথক পৃথক সেলে থাকেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে যারপরনাই চিন্তিত ছিলেন। শায়খুল হিন্দ রহ. বলেন, 'পুরো বন্দিকালের সাত বা আট দিন খুব বেশি পেরেশানিতে অতিবাহিত হয়েছে। কারণ, এক

[118]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৪১
[119]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৪২
[120]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৫৩

সাথি অপর সাথির ব্যাপারে নিকট কোনো সংবাদ ছিল না। সেই সাথে ছিল ফাঁসির আশঙ্কা।[121]

প্রায় একমাস তারা মিশরের এই রাজনৈতিক কারাগারে বন্দি ছিলেন।[122]

মাল্টার বন্দিজীবন

২৪ রবিউস সানি ১৩৩৫ হিজরি মোতাবেক ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ ও তার সঙ্গীরা মিশরের জিজা থেকে মাল্টার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[123] ইস্কান্দারিয়া বন্দর থেকে একটি বড় জাহাজে তাদের ওঠানো হয়। এই জাহাজে তারা ছাড়া একদল তুর্কি অফিসারকেও বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। টানা পাঁচ দিন জাহাজ চলার পর ২৯ রবিউস সানি ১৩৩৫ হিজরি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি মাল্টায় এসে নোঙর করে। অতঃপর শায়খুল হিন্দ রহ. এবং তার সঙ্গীদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।[124]

মাল্টার এই বন্দিসময়কে তারা জীবনের বড় গনিমত মনে করেছেন। শায়খুল হিন্দ রহ. অধিকাংশ সময় জিকির-আজকার, দোয়া-দরুদ ও মুরাকাবায় মগ্ন থাকতেন। অবসর সময়ে কুরআন অনুবাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে থাকেন।[125] এ ছাড়া সেখানে তুর্কি, আরবি ও অন্যান্য ইনকিলাবি নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত পারস্পরিক যোগাযোগ ও আলাপসালাপ চলতে থাকে।

শায়খুল ইসলাম হুসাইন মাদানি রহ. এ বন্দিকালীন সময়ে কুরআন হেফজ সম্পন্ন করেন। তুর্কি ভাষা রপ্ত করেন। তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেন।[126]

মাওলানা ওজায়ের গুল ও মাওলানা ওয়াহিদ আহমদ শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সংশ্রব-সান্নিধ্যে ফুয়ুজ ও বরকত লাভে কোনো প্রকার কমতি করেননি।

এমনিভাবে হাকিম নুসরত হুসাইন তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতার ওপর মেহনত করতে থাকেন।[127] তিনি কয়েক মাস অসুস্থ থেকে ৮ জিলকদ ১৩৩৫ হিজরিতে মাল্টার বন্দিশালায় ইন্তেকাল করেন।[128]

মাল্টার বন্দিজীবনের ওপর সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সফরনামায়ে শায়খুল হিন্দ। এটি শায়খুল হিন্দ রহ.-এর জানেশিন শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. রচনা ও বিন্যাস করেছেন।

[121]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৫৫
[122]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৬৩
[123]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৬৩
[124]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৬৮
[125]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ৯৫
[126]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ১১৮
[127]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ১১৮
[128]. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ১১৯

মাল্টা থেকে মুক্তি

২২ জুমাদিউস সানি ১৩৩৮ হিজরি মোতাবেক ১২ মার্চ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জুমার দিন শায়খুল হিন্দ রহ. ও তার সঙ্গীসাথিগণ মাল্টার বন্দিশালা থেকে মুক্তি পান।[১৩]

চন্দ্রবর্ষের হিসাব অনুযায়ী তিন বছর এক মাস একুশ দিন এবং সৌরবর্ষের হিসাবে তিন বছর উনিশ দিন বন্দি ছিলেন।

গ্রেফতার থেকে মাল্টার মুক্তি সবমিলিয়ে শায়খুল হিন্দ রহ. সৌরবর্ষের হিসাবে তিন বছর দুই মাস তেইশ দিন এবং চন্দ্রবর্ষের হিসেবে তিন বছর চার মাস বন্দি ছিলেন। এরমধ্যে মাল্টা থেকে যাত্রা করে হিন্দুস্তান পৌঁছাকালীন সময় অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাল্টা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা ১২ মার্চ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাল্টা থেকে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে ইস্কান্দারিয়া ও সাইয়েদি বাশার সুইজে বিরতি দেওয়ার কারণে হিন্দুস্তানে পৌঁছতে প্রায় তিন মাস লেগে যায়। ৮ জুন ১৯২০ মোতাবেক ২০ রমজান ১৩৩৮ হিজরিতে মুম্বাই বন্দরে এসে জাহাজ নোঙর করে।[১৪]

---

১৩. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ১২৫

১৪. সফরনামা আসিরে মাল্টা : ১২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় স্রোতে উলামায়ে কেরাম

- জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ গঠন
- জামেয়া মিল্লিয়া প্রতিষ্ঠা
- অসহযোগ আন্দোলন
- হিন্দুস্তানের পূর্ণ আজাদির দাবি
- লবণ আইনভঙ্গ আন্দোলন
- মুসলিম লীগ ও জমিয়তে উলামার ঐক্য
- মন্ত্রিপরিষদ গঠন

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জমিয়তে উলামার আত্মপ্রকাশ

শায়খুল হিন্দ রহ. ও তার সঙ্গীরা মাল্টার বন্দিশালা থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হিন্দুস্তানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ যদিও এ সময় বন্দি ছিলেন, কিন্তু মাওলানা মুফতি কেফায়েতুল্লাহ, ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারি, মাওলানা মুহাম্মদ আলি, হাকিম মুহাম্মদ আজমল খান ও মাওলানা আবদুল বারি ফিরিঙ্গি মহল্লির মতো শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আজাদি আন্দোলনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।

এরমধ্যে ৪ নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুফতি আজম মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ রহ. তাহরিকে শায়খুল হিন্দের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ও দেশান্তরের প্রতিবাদে এবং তাদের সসম্মানে মুক্তি ও স্বদেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আঞ্জুমানে এয়ানাত নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যার সভাপতি মাহমুদাবাদের সুলতান আলি মুহাম্মদ খান এবং ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন।[১৫১]

১৯১৯-এর নভেম্বরে দিল্লিতে মাওলানা ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খেলাফত কনফারেন্সের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ব্রিটিশদের বয়কট এবং তাদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্নের প্রস্তাব পাশ করা হয়। সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীও অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের পর্যাপ্ত সহযোগিতার ঘোষণা দেন।[১৫২] সম্মেলনে সমবেত আলেমগণ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নামে একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১৯-এর ২৮ ডিসেম্বর অমৃতসরে জমিয়তের প্রথম সম্মেলন ডাকা হয়। পূর্ব ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী ২৮ ডিসেম্বর মাওলানা আবদুল বারি ফিরিঙ্গি মহল্লি রহ.-এর সভাপতিত্বে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভারতবর্ষের আজাদির সুবিন্যস্ত রূপরেখা প্রস্তুত করা হয় এবং মুফতি কেফায়েতুল্লাহ দেহলবি রহ. সংগঠনের প্রথম গঠনতন্ত্রের খসড়া উপস্থাপন করেন।[১৫৩]

অস্থায়ীভাবে সর্বপ্রথম মাওলানা মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ.-কে সভাপতি এবং মাওলানা আহমদ সাইদ দেহলবি রহ.-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।[১৫৪]

---

১৫১. জমিয়তে উলামা পর এক তারিখি তাবসিরা : ৬৭
১৫২. জমিয়তে উলামা পর এক তারিখি তাবসিরা : ৫৯
১৫৩. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায় : ২/৫-১৬
১৫৪. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যা : ২/৭

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কর্মতৎপরতা

জুন মাসের ৮ তারিখ শায়খুল হিন্দ রহ. ও তার সঙ্গীদের বহনকারী জাহাজ এসে মুম্বাই বন্দরে নোঙর করে। তাদের স্বাগত ও বরণ করে নিতে হাজার হাজার ভারতবাসী বন্দরপানে ছুটে যায়। তাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও মাওলানা আবদুল বারি ফিরিঙ্গি মহল্লিসহ বড় বড় নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। শায়খুল হিন্দ রহ. তখন তাদের সঙ্গে আগামী দিনের করণীয় ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর মুম্বাই থেকে সরাসরি দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেন।[১৫৫]

এ সময় খেলাফত কনফারেন্স এলাহাবাদে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৫৬] সেমতে শায়খুল হিন্দ রহ. ১৯ জুলাই ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের ফাতওয়া জারি করেন এবং ইংরেজ সরকারকে সম্পূর্ণ বয়কটের ঘোষণা দেন।[১৫৭] পরবর্তী সময় শায়খুল হিন্দ রহ.-এর এ ফাতওয়া মাওলানা আবুল হাসান সাজ্জাদ রহ. বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যাসহ পরিপাটি করেন; যা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে ৪৭৪ জন আলেমের স্বাক্ষরসহ বিলি করা হয়।[১৫৮]

৬ ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দুই শ আলেম ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের বৈধতা প্রদান করেন।[১৫৯]

জামেয়া মিল্লিয়া প্রতিষ্ঠা

জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লির প্রতিষ্ঠা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের ফসল এবং এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন শায়খুল হিন্দ রহ.।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন শায়খুল হিন্দ রহ. আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির মতো একটি মুক্ত স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ উপলব্ধি বাস্তবায়ন করা কঠিন জানা সত্ত্বেও তিনি আলিগড় সফর করেন। সেখানে ২৯ অক্টোবর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ রহ. জামেয়া মিল্লিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন।[১৬০] প্রথমে এই জামেয়া আলিগড়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী সময় দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। ভিত্তি

---

১৫৫. আসিরানে মাল্টা : ৫১-৫৫
১৫৬. তাহরিকে খেলাফত : ১৫৫
১৫৭. আসিরানে মাল্টা : ৫৩
১৫৮. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায় : ২/৪০
১৫৯. জমিয়তে উলামা পর তারিখি তাবসিরা : ৫৮
১৬০. উলামায়ে হক : ১/২১৯

স্থাপনের সময় শায়খুল হিন্দ রহ.-এর পক্ষ থেকে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. সভাপতির বক্তব্য রাখেন।[১৬০]

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দ্বিতীয় সাধারণ সম্মেলন

১৯-২০-২১ নভেম্বর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দ্বিতীয় সাধারণ সম্মেলনে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নাম সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের পোক্ত নিয়তে তিনি যথারীতি দিল্লিও গমন করেছেন। কিন্তু অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতার কারণে শেষতক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তার পক্ষ থেকে মাওলানা মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ. সম্মেলনের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।[১৬১]

গোটা হিন্দুস্তানে তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আর তা ছিল সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে। এ আন্দোলনকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আলেমগণই সর্বপ্রথম বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সম্মেলন থেকে পূর্ণ শক্তির সাথে এ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার কোনো সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণ হারাম। আর তা বাস্তবায়নে বিশেষভাবে এই পদক্ষেপগুলো জরুরি–

১. সরকারি সব রকমের সম্বোধন এবং সম্মান ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করা।

২. কাউন্সিল থেকে সদস্যদের পৃথক হয়ে যাওয়া।

৩. ইংরেজদের ব্যাবসায়িক কোনো উপকার না করা।

৪. কলেজ ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের জন্য কোনো প্রকার সরকারি সহযোগিতা গ্রহণ না করা।

৫. সরকারি ইউনিভার্সিটির সাথে সম্পর্ক না রাখা।

৬. ইংরেজ বাহিনীতে চাকরি না করা এবং ইংরেজদের কোনো প্রকার সামরিক সহযোগিতা না করা।

৭. ইংরেজদের আদালতে মামলা-মুকাদ্দমা দায়ের না করা এবং তাদের নির্দেশ না মানা।

ইত্যকার গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক নির্দেশনা সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়।[১৬২]

---

১৬০. আসিরানে মাল্টা : ৫৭
১৬১. তারিখি তাবসিরাহ : ৬০
১৬২. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায় : ২/৩৭

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইন্তেকাল

উক্ত সম্মেলনের মাত্র নয় দিন পর ৩০ নভেম্বর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে আজাদি আন্দোলনের মহান নেতা শায়খুল হিন্দ রহ. দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন।[১৬৩]

অসহযোগ আন্দোলন

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইন্তেকালের পর অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো ভাটা পড়েনি; বরং পূর্বের চেয়ে আরও অধিক প্রেরণা ও সাহসে বলীয়ান হয়ে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর মিশনকে সফল করার জন্য আলেমসমাজ ময়দানে নেমে আসেন। বেশ জোরেশোরে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এদিকে ইংরেজরাও বসে থাকেনি। তারাও আলেমদের পেছনে লেলিয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের যে ফাতওয়া প্রকাশ করা হয়েছিল তা ইংরেজরা জব্দ করে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর উত্তরসূরি শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি, মাওলানা মুহাম্মদ আলি জওহর, মাওলানা শওকত আলি, মাওলানা নেসার আহমদ কানপুরি, পির গোলাম মুজাদ্দেদ ও ডাক্তার সাইফুদ্দিনকে গ্রেফতার করে। অপরদিকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ.-এর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তের সাধারণ সম্মেলনেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অসহযোগ আন্দোলনের ফাতওয়া প্রচার করা হয়। মোটকথা, জমিয়তে উলামা পরিপূর্ণভাবে ও সর্বোচ্চ কঠোরতার সাথে অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবাসীর সাথে অংশগ্রহণ করে। সেই সাথে আন্দোলনে অহিংসতার প্রতিও পূর্ণ লক্ষ রাখে। অবশেষে চৌরাচুরির ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এ আন্দোলনে ত্রিশ হাজার মানুষ বন্দি হয়ে কারাভোগ করেন। এরমধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলমান; যারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগদান করেছিল।[১৬৪]

চৌরাচুরি হলো একটি জায়গার নাম। গ্রামটি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে উত্তেজিত জনতা থানায় আক্রমণ করে এবং থানায় অগ্নিসংযোগ করে ২৩ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। জনতার এই কর্মকাণ্ড মহাত্মা গান্ধীর ঘোষিত অহিংস আন্দোলনের পরিপন্থি ছিল। এজন্য এই ঘটনাটিকে তারা বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।[১৬৫]

---

১৬৩. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায় : ২/৩৭
১৬৪. মুসলিম উলামা কা কিরদার : ৩৩
১৬৫. তাহরিকে খেলাফত : ২৪৩

শুদ্ধি সংগঠনের মোকাবিলা

খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে গোটা ভারতবাসী ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একই প্ল্যাটফর্মে চলে আসে। এই ঐক্য ইংরেজদের জন্য মরণঘাতী হয়ে দেখা দেয়। এজন্য তারা এই ঐক্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আজাদি আন্দোলনকে স্তিমিত করতে হিন্দুদের শুদ্ধি আন্দোলনকে উস্কে দেয়।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শুদ্ধি আন্দোলনের ফেতনা নির্মূলের জন্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 'শুবায়ে তাবলিগ ও হেফাজতে ইসলাম' নামে একটি পৃথক শাখা সংগঠন চালু করে। এই সংগঠনের অধীনে আলেমসমাজ কাজ শুরু করেন এবং তাদের জোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমানকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনেন। অতঃপর তাদের দ্বীনি ও নৈতিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করেন। এই কাজের প্রভাব ভারতবর্ষে আজও অব্যাহত আছে।

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবি

সর্বপ্রথম জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ হিন্দুস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতার আওয়াজ তোলেন। ইতিপূর্বে কেবল আংশিক স্বাধীনতার দাবি করা হচ্ছিল। ১১-১৪ মার্চ ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবি রহ.-এর সভাপতিত্বে জমিয়তে উলামার সপ্তম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করা হয়। পরবর্তী সময় পেশোয়ারে ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জমিয়তের অষ্টম সাধারণ সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি আদায়ে বিশেষভাবে এই কথা বলা হয় যে, 'আজাদি এমনি এমনি লাভ করা যায় না; বরং নিজেদের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।'

সেদিনের সম্মেলনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে সাইমন কমিশনকে পরিপূর্ণ বয়কটের প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি

. শুদ্ধি একটি সংস্কৃত শব্দ। হিন্দুধর্ম ত্যাগকারীদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা হিন্দু সমাজের একটি সামাজিক আন্দোলন এটি। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অহিন্দু ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের অবস্থানকে উন্নত করে মূলধারার সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহত করা, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা। (অনুবাদক কর্তৃক উইকিপিডিয়া থেকে সংযোজিত)

. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায়?

. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায়? : ২/১১৯

. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায়? : ২/১৪৫

. সাইমন কমিশন ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাত সদস্য দ্বারা গঠিত একটি কমিশন, যারা ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের সংবিধান পুনর্গঠন করতে এসেছিলেন। ভারতীয় সমস্যাবলি অনুসন্ধান করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এর সভাপিত স্যার সাইমনের নামানুসারে এই কমিশন সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। (অনুবাদক কর্তৃক উইকিপিডিয়া থেকে সংযোজিত)

করে কংগ্রেসও ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাজে অনুষ্ঠিত তাদের সম্মেলনে সাইমন কমিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করে।

সাইমন কমিশন ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন থেকে হিন্দুস্তানে আসে। কিন্তু সকল ভারতীয় নাগরিকের বয়কট এবং তাদের প্রতি জনসাধারণের অসহযোগিতামূলক মনোভাব দেখে ৪ মার্চ ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা ব্রিটেনে ফিরে যায়। ফলে তাদের এই মিশন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

নেহেরু রিপোর্ট

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু কমিটির প্রধান মতিলাল নেহেরু ভারতে ব্রিটিশ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়ে সংবিধানের একটি খসড়া পেশ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য আরও কিছু দাবি এমন ছিল, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় বিরোধ ছিল। তাই জমিয়তে উলামা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন এবং এজন্য তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসকে তারা কোনো প্রকার সহযোগিতা করেননি। অবশেষে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পুনর্বিবেচনা করে কংগ্রেস ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করে।

কংগ্রেসের পাঁচ বছর পূর্বে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন এবং সকলের সামনে এই আওয়াজ সুউচ্চ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জমিয়তে উলামা ভারতবর্ষের আজাদি আন্দোলন সূচনার গৌরব লাভ করেন।

লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন

আজাদি আন্দোলনে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনের নাম খুব শোনা যায়। ১২ মার্চ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের সূচনা করেন।

উলামায়ে কেরাম এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ডান্ডিতে যে লবণ উৎপন্ন হতো তা ইংরেজ সরকার নিজেরা ব্যবহার করত এবং তাদের দেশে নিয়ে যেত। এই একচেটিয়া লবণ নীতির প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন। এটি ছিল সম্পূর্ণ পদযাত্রা কর্মসূচি। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্যগণও এই লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেন। জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ., সাধারণ

. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায়? : ২/১৪৫

. মাওলানা আজাদ কি সিয়াসি ডায়েরি : ২১২-২১৪

. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ৭৩

. রইসুল আহরার : ১৩২

সম্পাদক মাওলানা আহমদ সাইদ নাজেম রহ. এবং জমিয়তে উলামার নেতৃবৃন্দ ছাড়াও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানবি, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ নাইম লুধিয়ানবি, মাওলানা সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি, মাওলানা ফখরুদ্দিন মুরাদাবাদি, মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি, মাওলানা আবদুল কাদের, মাওলানা মুহাম্মদ শাহেদ ফাখেরি, মাওলানা নুরুদ্দিন বিহারি, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি, মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক করাচি, মাওলানা আবদুল আজিজ গুজরাওয়ালি রহ. প্রমুখ জমিয়তের নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে সাজা ভোগ করেন।

আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩১-১৯৩২

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ১৯৩০ সালে আমরোহায় অনুষ্ঠিত তাদের নবম সাধারণ সম্মেলনে আজাদি আন্দোলনে কংগ্রেসকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ঘোষণা দেয়। সেমতে জমিয়তে উলামা এবং তাদের সকল নেতৃবৃন্দ ও সদস্য ১৯৩১-৩২ সালের কংগ্রেস ঘোষিত ইংরেজদের আইন অমান্য আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের ধরন ছিল, জমিয়তের পক্ষ থেকে একজন করে ডিক্টেটর মনোনীত করা হতো, তার নেতৃত্বে বিরাট সংখ্যক মানুষ স্বেচ্ছায় ইংরেজদের হাতে গ্রেফতার হতো।

জমিয়তের পক্ষ থেকে প্রথম ডিক্টেটর মনোনীত করা হয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ.-কে। তার নেতৃত্বে স্বেচ্ছায় এক লাখ লোক দিল্লির আজাদ পার্কে গ্রেফতার হন। এ সময় তারা আঠারো মাস কারাবন্দি ছিলেন।

মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ.-এর পর আরও অনেক আলেম স্বেচ্ছায় কারাবন্দি কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। ক্রমানুসারে তারা হলেন–

১. মাওলানা বশির আহমদ রহ.
২. মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ.
৩. মাওলানা নুরুদ্দিন বিহারি রহ.
৪. মাওলানা আবদুল হালিম সিদ্দিকি রহ.
৫. শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.
৬. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ নাইম লুধিয়ানবি রহ.
৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সাম্ভলি রহ.
৮. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.
৯. মাওলানা আবদুল্লাহ দেওবন্দি রহ.
১০. মাওলানা মুবারক হুসাইন সাম্ভলি রহ.

. সেহ রোজ ওয়া জমিয়ত : ১৯৩

. আল-জমিয়ত; মুফতি আজম সংখ্যা : ৪৪-৪৫

তাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. দেওবন্দ থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে গ্রেফতার হন। মাওলানা আহমদ সাইদ দেহলবি রহ. এবং মাওলানা হাবিবুর রহমান এই আন্দোলনের শুরুতেই গ্রেফতার হন। উপর্যুক্ত আলেমদের কাউকে দেড় বছর, কাউকে দুই বছরের জন্য কঠিন সাজা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামা ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার জমিয়ত নেতৃবৃন্দ এই স্বেচ্ছায় কারাভোগের কর্মসূচি পালন করেন।

এক ধারণা মতে প্রায় নব্বই হাজার মানুষ গ্রেফতার হন, যাদের মধ্যে চুয়াল্লিশ হাজার ছিলেন মুসলমান।

তখন ইংরেজরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, এভাবে জোরজবরদস্তি ও ক্ষমতাপ্রয়োগ করে বেশিদিন হিন্দুস্তানে রাজত্ব ধরে রাখা যাবে না। আর না এখানকার অধিবাসীদের অধিকার পদদলিত করে বিশাল এই রাজ্য নিজেদের করায়ত্তে রাখা সম্ভব হবে। এজন্য তারা ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ করে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে।

উক্ত সংবিধানে আইনত অনুমোদিত সংগঠনগুলোর মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অনুমোদন দেওয়া হয়। আর তা বাস্তবায়নে সাধারণ ইলেকশনের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু ইংরেজরা সেই নির্বাচনের রূপরেখা নিজেদের কূটকৌশল ও চালবাজির মাধ্যমে এমনভাবে তৈরি করে, যার ফলে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মাঝে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়।

নির্বাচনের রূপরেখা

নির্বাচনের রূপরেখা ধর্মের ভিত্তিতে সাজানো হয়। অর্থাৎ, হিন্দু সম্প্রদায় কেবল হিন্দু প্রার্থীদের এবং মুসলিম সম্প্রদায় মুসলিম প্রার্থীদের ভোট দিতে পারবে। সেই থেকে ইংরেজরা উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিমের মাঝে ঘৃণাবোধের বীজ বপন করে দিয়েছে।

১৯৩৫-এর নির্বাচনের পূর্বে গোটা রাষ্ট্রে মুসলিম নেতৃত্বের ডোর ছিল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের হাতে। তাদের গ্রহণযোগ্যতা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং অমুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝেও বিপুল আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। হিন্দুস্তানের আলেমদের মানমর্যাদা তারাও পরিপূর্ণ অনুভব করছিল। জমিয়তে উলামার বিপরীতে মুসলমানদের অন্য আরেকটি দল ছিল মুসলিম লীগ। যদিও ১৯০৬ সাল থেকে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ ছিল। পরবর্তী উনত্রিশ বছর পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের কোনো পদচারণা ছিল না। দলটির প্রধান নেতা মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর স্বেচ্ছায় লন্ডনে নির্বাসন, সংকীর্ণ দলাদলি ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম লীগ দুর্বল ও মৃতপ্রায় সংগঠনে পরিণত হয়। এই দলের নেতৃবৃন্দ সাধারণত ছিলেন উঁচুশ্রেণির

. কারওয়ানে আহরার : ১০৬

বিলাসপ্রিয় লোকজন। সবাই কলোনি ও প্রাসাদে বসবাসকারী ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্নভাবে তারা ইংরেজদের দালালিতে মত্ত ছিল। হিন্দুস্তানের আজাদি নিয়ে তাদের কোনো অনুভূতি ছিল না। আজাদি আন্দোলনের দীর্ঘ সময়ে তাদের কাউকে কোনো কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। এ নিয়ে তাদের হৃদয়ে কোনো আবেগ ভালোবাসা ছিল না। ব্রিটিশদের তল্পিবাহক হয়ে থাকাকেই তারা সানন্দে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালে যখন ভারত শাসন আইন পাশ হলো, চারদিকে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হলো, তখন ক্ষমতা লাভের মানসে মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারকরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দীর্ঘদিন রাজনীতি ও আন্দোলন সংগ্রামের বাইরে থাকার ফলে মুসলিম লীগ জনসাধারণের মাঝে তেমন পরিচিত ছিল না। তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্বও নেই, আর না ভবিষ্যতে তাদের উজ্জ্বল কোনো সম্ভাবনা ছিল। তাহলে ভোট পাবে কোত্থেকে? এজন্য তারা বিকল্প কৌশল অন্বেষণ করতে লাগল। দীর্ঘ চিন্তাভাবনা করে নিজেদের চতুরতা কাজে লাগিয়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এবং এর সমমনা দলগুলোর সাথে নির্বাচনি জোট গঠন করল। যদিও এ ক্ষেত্রে জমিয়তের সমমনা একটি দল জামাতে মজলিস মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট করার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তথাপিও শেষ পর্যন্ত এই জোট গঠিত হয়।

এই জোট গঠনের মাধ্যমে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ মুসলিম লীগকে শুধু মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তোলেনি; বরং নেতৃত্ব ও ক্ষমতার সম্মানজনক আসনে সমাসীন করেছেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বিশেষ কৃপা ফলে মুসলিম লীগ ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। অন্যথায় তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ এবং হিন্দুস্তানের রাজনীতিতে তাদের আর ঠাঁই হতো না।

কিন্তু পরিশেষে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যে মুনাফিকি, কপটতা, ধূর্ততা ও ধোঁকাবাজি করেছে তা সর্বোচ্চ ঘৃণার যোগ্য। যে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ জনসাধারণের মাঝে পরিচিতি লাভ করেছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের সাহস করেছে এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম কমিউনিটিতে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে, সেই জমিয়তকে পরবর্তী সময় মুসলমানদের নেতৃত্ব থেকে মাইনাস করতে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেনি। রাজনৈতিক স্বার্থ যখন পুরোপুরি হাসিল হয়ে গেল তখন যে সকল শর্তের ভিত্তিতে জোট গঠন হয়েছিল, তার সবগুলো তারা অমান্য ও পদদলিত করে।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দের অন্তরে জাগতিক কোনো লালসা এবং নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কোনো অভিলাস ছিল না। তারা কেবল রাষ্ট্র ও মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতি ছিল তাদের মনোনিবেশ। তাদের ভাবনা ছিল, যেভাবেই হোক ঐক্য ও জোটবদ্ধ হয়ে ভারতের আজাদি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং এ ক্ষেত্রে নিজেদের সর্বোচ্চ উজাড় করে দেশ ও মিল্লাতের কল্যাণ লাভ করা। তাদের নিখাদ সরলতা এবং হৃদয়ে লালিত এই

দ্বীন-দরদি ও দেশপ্রেমিক চিন্তাচেতনার পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করে মুসলিম লীগ। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য জমিয়তে উলামাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে তারা।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নিছক আজাদি ও ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলিম লীগের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়ে নির্বাচনি জোট গঠন করে–

১. ইংরেজদের সাদা কাগজ চুক্তি দ্রুত বাতিলে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. ইংরেজদের পাশ করা সকল আইন রহিত করানো। প্রত্যেক এমন প্রস্তাবনার বিরোধিতা করা যেগুলো রাষ্ট্রের আজাদির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নির্দেশনা মান্য করা।

৩. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ যে সমস্ত আইনি বিষয় এসেম্বলিতে উপস্থাপন করা জরুরি মনে করবে সেগুলোর প্রতি সমর্থন জানানো। ধর্মীয় ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে জমিয়তের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।[১০৮]

এই প্রস্তাবগুলো জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করা হয়। যদি তারা এগুলো বিনাদ্বিধায় মেনে নেয়, তবেই রাজনৈতিক ঐক্য হবে, অন্যথায় নয়। মুসলিম লীগ বিনাবাক্যে প্রতিটি শর্ত মেনে নেয়। তখন তাদের মাঝে প্রাদেশিক নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক জোট গঠন হয়। তারপর থেকে জমিয়তে উলামা কেবল রাষ্ট্র ও কওমের স্বার্থে মুসলিম লীগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

উপর্যুক্ত বিশদ আলোচনা থেকে এ কথা বোঝা গেল যে, মুসলিম লীগের মাঝে প্রাণ সঞ্চারকারী দলটি ছিল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। যদি সে সময় তারা জমিয়তের সমর্থন ও সাহায্য না পেত, তবে মুসলিম লীগ আদৌ জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হতো না।

মন্ত্রিপরিষদ গঠন

১৯৩৬ সালে এই প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে জয় লাভ করে শাসন শুরু করে। এ সময় নির্বাচন উপলক্ষ্যে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস পারস্পরিক দূরত্ব মিটিয়ে একে অপরের অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছিল। তখন তারা যদি সতর্কতার সাথে কৌশল অবলম্বন করে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করত, তাহলে ইংরেজদের বিতাড়ন ও হিন্দুস্তানের আজাদির মঞ্জিল বেশ নিকটবর্তী হয়ে যেত। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। উভয় দলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক মতবিচ্ছিন্নতা ও ধর্মীয় ঘরানাকেন্দ্রিক এমন কিছু

১০৮. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ৮৩

কারণ বিদ্যমান ছিল, যার অপরিণামদর্শিতা ও প্রোপাগান্ডা আর লোকমুখে শোনা ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ফলে তাদের মাঝে ক্রমশ পরস্পরের প্রতি ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়।

যে প্রদেশে কংগ্রেস বিজয়ী হয়েছে সেখানে মুসলিম লীগ দ্বিতীয় পার্টি হিসেবে উপেক্ষিত ছিল। অথচ কল্যাণের দাবি ছিল, মুসলিম লীগকেও নিঃশর্তে হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত করা। দল-মত, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দুস্তানের বিচক্ষণ, বিদগ্ধ ও চিন্তাশীল লোকজন এমনটিই চাচ্ছিল। কিন্তু দলের উগ্রপন্থি পার্লামেন্ট মেম্বার ও দলের অবিবেচক লোকজন ক্ষমতা বলে মুসলিম লীগকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত না করার জোর দাবি করে। এর পরিণাম এই ছিল যে, মুসলিম লীগ তখন তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচারণে মেতে ওঠে। তাদের এই কর্মকাণ্ডের পরিণামে হিন্দুস্তানের আজাদি প্রলম্বিত হয়। আর অপরদিকে মড়ার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবে মুসলিম লীগ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মধ্যকার রাজনৈতিক জোট ভেঙে যায়।[১৬০]

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের গঠিত মন্ত্রিসভা কাজ করতে থাকে। এই বছরেরই শেষ দিকে সকলে প্রতিবাদ জানিয়ে সকলে একসঙ্গে দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।[১৬১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সালে জার্মান ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে পুরো দুনিয়াকে ভয়ানক বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। মৌলিকভাবে এই বিশ্বযুদ্ধের সাথে হিন্দুস্তানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ব্রিটেন তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য হিন্দুস্তানকে এ যুদ্ধে জড়ানোর ঘোষণা দেয়। ফলশ্রুতিতে হিন্দুস্তানের প্রায় দুই লাখ জনগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। ব্রিটিশদের এহেন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ৩১ অক্টোবর ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সকল মন্ত্রী পদত্যাগ করেন।[১৬২]

মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হিন্দুস্তানের প্রতি পূর্বের চেয়ে আরও অধিক যত্নশীল হয়। এখানকার জনগণের সার্বিক অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই শর্তও তারা জুড়ে দেয় যে, চলমান বিশ্বযুদ্ধে হিন্দুস্তান ব্রিটেনকে সর্বাত্মক সহায়তা করতে হবে।[১৬৩]

কংগ্রেস ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কঠোরভাবে এই শর্তের বিরোধিতা করে। জমিয়তে উলামা জৌনপুরে অনুষ্ঠিত ১৯৪০ সালের সম্মেলনে যুদ্ধে ব্রিটেনকে সহায়তা না করার প্রস্তাবনা পেশ করে। সেই সঙ্গে উক্ত সম্মেলনে

১৬০. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ৯৪
১৬১. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ৯৪
১৬২. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ৯৪
১৬৩. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১০১

হিন্দুস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির সাথে সাথে ইংরেজদের বয়কটেরও ঘোষণা দেয়।[১৬৪]

বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সহযোগিতা না করা এবং হিন্দুস্তানে ইংরেজদের বয়কটের দাবি বাস্তবায়নে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ বিভিন্ন প্রদেশে প্রত্যক্ষ কার্যক্রম শুরু করে। এই ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার বেশ রুষ্ট হয় তাদের প্রতি। জমিয়তের নেতৃবৃন্দ অনেককে গ্রেফতার করে কঠিন সাজা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি, মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা আহমদ আলি লাহোরি, মাওলানা কাসেম শাহজাহানপুরি, মাওলানা আবুল ওয়াফা শাহজাহানপুরি, মাওলানা মুহাম্মদ শাহেদ ফাখেরি, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সিম্ভলি ও মাওলানা আখতারুল ইসলাম রহ. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৬৫]

বিভীষিকাময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল, যাতে এক রিপোর্ট অনুযায়ী সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ হতাহত হয়েছে।[১৬৬]

মুসলিম লীগ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা

জমিয়তে উলামা সর্বদাই হিন্দুস্তানের পূর্ণ আজাদির দাবি করে আসছিল। এই দাবির মূল কারণ ছিল, জমিয়তের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করতেন, হিন্দুস্তানের আজাদির ওপর আরও অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের আজাদি নির্ভর করছে। হিন্দুস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া সে সকল মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না। অপরদিকে মুসলিম লীগের মূল চাওয়া ছিল, ইংরেজদের অধীনস্থ হয়ে হিন্দুস্তানের অস্থায়ী শাসনভার গ্রহণ করা। তাদের সার্বিক দাবি-দাওয়া মূলত একে কেন্দ্র করেই ছিল। মুসলিম লীগ ও জমিয়তে উলামা দুটি মুসলিম দল হলেও হিন্দুস্তানের আজাদির ব্যাপারে তাদের চিন্তাচেতনায় ছিল আসমান ও জমিনের ফারাক। তথাপিও ১৯৪০ সালের শুরুতে কতক লোক মুসলিম লীগ ও জমিয়তে উলামার শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মাঝে একটি সমঝোতা তৈরির জোর প্রচেষ্টা চালায়। সেই প্রচেষ্টার ফল কী ছিল সে সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া তার ভাষায় লেখেন–

মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ.-এর মধ্যস্থতায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হিন্দুস্তানের চলমান এই পরিস্থিতিতে মুসলিম দুটি দলের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাদ ও দ্বন্দ্ব জিইয়ে না রেখে কীভাবে সেগুলো মিটিয়ে একে অপরের অধিক কাছাকাছি হওয়া যায়–সে চেষ্টা করা উচিত আমাদের। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে থাকে। তখন মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলিম লীগের

১৬৪. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১০১
১৬৫. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১০৩
১৬৬. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ৮৯

পক্ষ থেকে এই শর্ত দেন যে, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দকে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে তাদের নির্দেশনা মেনে কাজ করতে হবে। জমিয়তে উলামার সভাপিত মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ. হিন্দুস্তানের আজাদির বৃহৎ কল্যাণ চিন্তা করে মুসলিম লীগের শর্ত মেনে নেবেন বলে জানান। সেই সঙ্গে জমিয়তের পক্ষ থেকে মুসলিম লীগকে এ শর্ত দেওয়া হয়, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে হিন্দুস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতার একটি নির্দিষ্ট দাবি ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করতে হবে। যদি ব্রিটিশ সরকার এই দাবি না মানে তাহলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। কিন্তু মিস্টার জিন্নাহ তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

এখানে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়ে জমিয়তে উলামার বেরিয়ে আসাটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না। কারণ, জমিয়ত কংগ্রেসের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো শরিক দল ছিল না। এমনকি জমিয়তের সভাপতি মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ. কখনো কংগ্রেসের চার আনা মেম্বারও ছিলেন না। কংগ্রেসের সাথে জমিয়তের কেবল এতটুকু শরিকানা ও যোগাযোগ ছিল যে, কংগ্রেস ও জমিয়ত একসঙ্গে হিন্দুস্তানের পূর্ণ আজাদির লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে। কংগ্রেস যখন হিন্দুস্তানের আজাদি অর্জনে মাঠে নামে তখন জমিয়তে উলামা এটিকে নিজেদের জন্য ফরজ কাজ মনে করেছে এবং সকল নেতৃবৃন্দ ও সদস্য উক্ত ফরজ আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের তাতে অংশগ্রহণের প্র্যাক্টিক্যাল আহ্বান জানিয়েছেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই আক্রমণাত্মক আন্দোলন মুসলিম লীগ, বিশেষ করে মিস্টার জিন্নাহর জন্য ভীতিজনক ছিল, সর্বদা তিনি এসব আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করছিলেন।[১৬৭]

[১৬৭]. উলামায়ে হক আওর উনকা মুজাহিদানা কারনামা : ২/৯৮

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষণিকের ভুল শতাব্দীর কান্না

- ভারত ছাড়ো আন্দোলন
- পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের বাসনা
- জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাদানি ফর্মূলা
- নির্বাচনের হতাশাজনক ফলাফল
- মানুষের লাশের ওপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম
- আলেমদের শঙ্কা সঠিক প্রমাণিত হলো

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো (আজাদি) আন্দোলনে আলেমসমাজ সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতারণে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন।

ইউরোপে তখন চলছে পুরোদমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে ব্রিটেনের সহায়তার তীব্র প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানের জনসাধারণ প্রথম থেকেই বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। এজন্য ব্রিটিশ সরকার হিন্দুস্তানি জনসাধারণকে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি বিশেষ মিশন দিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ট ক্রিপসকে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করে; যেন হিন্দুস্তানের আজাদি আন্দোলনের নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকার গঠনের ব্যাপারে আশ্বস্ত করা যায়। সেই সঙ্গে যুদ্ধ পরবর্তী কালে হিন্দুস্তানের জন্য ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রদান, প্রাদেশিক আইনসভা ও দেশীয় রাজ্যগুলোর দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন কমিটি নির্বাচন ইত্যাদি প্রস্তাব দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল, এসবে সন্তুষ্ট হয়ে হিন্দুস্তান যেন বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সহায়তা করে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিনিময়ে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলে। কিন্তু হিন্দুস্তানের নেতৃবৃন্দ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তাদের দাবি ছিল, বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এবং এখনই নির্বাচন দিতে হবে। অবশেষে দাবি না মেনে নিলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মিশন প্রত্যাখ্যান করে।[illegible]

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রতি প্রচণ্ড নাখোশ ও ক্ষুব্ধ হয়। তাদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে। সর্বপ্রথম ১৯৪২-এর জুন মাসে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-কে একটি বক্তব্যের জেরে গ্রেফতার করে।[illegible] এরপর আগস্ট মাসে কংগ্রেস এক সম্মেলন থেকে ইংরেজদের দ্রুত হিন্দুস্তান ছাড়ার আল্টিমেটাম দেয়, অন্যথায় কঠিন পরিণতির স্বীকার হবে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কংগ্রেসের এই দাবির পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জানায়।[illegible]

[illegible]. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১০৮
[illegible]. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১১৪
[illegible]. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১১৭

এর প্রেক্ষিতে গোটা হিন্দুস্তানে কংগ্রেসের কর্মী ও আজাদি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ওপর গ্রেফতার অভিযান শুরু করে। কিন্তু এই গ্রেফতার অভিযান ভারতবাসীকে দমানোর পরিবর্তে তাদের হৃদয়ে আজাদির স্পৃহা ও জোশ-জজবা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। ইংরেজদের দমন-পীড়ন তাদের হৃদয়ে জ্বলতে থাকা আগুনে ঘি ঢালার ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের সর্বত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে দ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ক্ষোভে ফেটে পড়া জনতা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেয়। রেললাইন তুলে ফেলে। প্রশাসনিক কার্যালয় ও থানায় অগ্নি সংযোগ করে।[illegible]

প্রায় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। সামরিক বাহিনী ও পুলিশ কার্যত অক্ষম হয়ে পড়ে। এরপর সরকার কঠিন দমন-পীড়ন ও ধরপাকড়ের মাধ্যমে আন্দোলনের তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ বিদ্রোহীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ে। বিরাট সংখ্যক জনতা হতাহত হয়। এতে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সাময়িক স্থিমিত হয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের উপলব্ধি হয় যে, হিন্দুস্তানকে আর ব্রিটিশ রাজত্বাধীন রাখা সহজ হবে না।

শিমলা কনফারেন্স

১৯৪৩ সালে হিন্দুস্তানের জালেম ও নিপীড়ক ভাইসরয় লর্ড লিনথিলগোর স্থলে লর্ড ওয়াভেল ভাইসরয় নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪২ সালে গ্রেফতার হওয়া আজাদি আন্দোলনের নেতাদের জেলমুক্তির ঘোষণা দেন। ১৯৪৪-এর মে মাস থেকে ১৯৪৫-এর জুন মাসের ভেতর সকল নেতাকে জেলমুক্তি দেন।[illegible]

নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল হিন্দুস্তানের আজাদির প্রথম ধাপ হিসেবে বৃহৎ পরিসরে একটি নির্বাচনের পরিকল্পনা করেন, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম বৃহৎ দুই সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা সমান হবে। সেই সঙ্গে আরও কিছু পরিকল্পনা তার ছিল। ইতিহাসে তা ওয়াভেল পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ওয়াভের একটি কনফারেন্স ডাকেন, যেখানে কংগ্রেস, মুসলিম ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দসহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।[illegible]

কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কারণ, মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ এ শর্ত যোগ করার চেষ্টা করেন, নির্বাচনে যে সকল মুসলিম প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তারা সবাই মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হতে হব। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল

[illegible]. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১১৯
[illegible]. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১১৮
[illegible]. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১৫৩

জিন্নাহর এই শর্তে অস্বীকৃতি জানান। ফলে লর্ড ওয়াভেল যে নির্বাচনের পরিকল্পনা করেছেন তা বাস্তবায়িত হয়নি।

পাকিস্তান তৈরির বাসনা

শিমলা কনফারেন্সের ব্যর্থতা এবং ক্রিপস মিশন প্রত্যাহার করার পর ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল লন্ডন সফর করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এসেম্বলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই ধর্মীয় ঘরানার ওপর ভিত্তি করে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

ঘোষণা হওয়া মাত্রই সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

১৯৪৬-এর এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ এই কথা প্রমাণ করার জন্য জোর চেষ্টা করে যে, হিন্দুস্তানে মুসলিম রাজনৈতিক দল বলতে কেবল মুসলিম লীগই রয়েছে। এ ছাড়া অন্য আর কোনো দল মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে হিন্দসহ অন্যান্য মুসলিম রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্লামেন্ট বোর্ড গঠন করে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্লামেন্ট বোর্ডের প্রধান ছিলেন শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.।

মুসলিম লীগের নির্বাচনি ইশতেহার

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সাল থেকেই ক্রমাগত পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে আসছিল। ৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম জনগণকে নিজেদের দিকে টানতে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকেই তাদের নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে। তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম দ্বন্দ্বকে তারা পরিপূর্ণ কাজে লাগায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে হিন্দুস্তান থেকে পৃথক হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুফল ও উপকারিতা হিসেবে এমন এমন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তারা জাতিকে দেখাতে শুরু করে, যার ফলে বোঝবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ নিয়ে মুসলিম লীগের তৎপরতা ও উচ্ছ্বাস দেখে মনে হচ্ছিল, এটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন না হয়ে বরং হিন্দুস্তানের কোনো ভূখণ্ডে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হচ্ছে। এমনকি তৎকালীন অনেক বড় বড় আলেমও মিস্টার জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান

. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১৫৩
. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১৫৫
. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১৬৪

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, চারদিকে অনবরত প্রচার-প্রসার করে এমন জনমত গড়ে তোলে যে, কোনো ব্যক্তি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি শব্দ শোনার জন্যও প্রস্তুত ছিল না।

মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা তাদের এই অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের সমর্থন যেসব মুসলমান করেনি তাদের কাফের-মুশরিকের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট মনে করতে থাকে। এ কারণে ১৯৪৫-এর নির্বাচনে যারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গিয়ে মুসলিম পার্লামেন্ট বোর্ড গঠন করে এবং যারা তাতে সমর্থন ও অংশগ্রহণ করেছে, মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা তাদের ক্ষোভের নিশানা বানায়। বিশেষত শায়খুল ইসলাম হুসাইন মাদানিকে তাদের জিঘাংসা ও ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। বর্ষীয়ান আলেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মহান নেতার সঙ্গে বাংলার রংপুর জেলার সাইয়েদপুর ও ভাগলপুরসহ অন্যান্য জায়গায় অত্যন্ত ন্যক্কারজনক আচরণ করে। শায়খুল ইসলাম এসব কিছু নীরবে সহে যান। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে পরিভ্রমণ করেন এবং নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে মুসলিম লীগের ঘোষিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কুফল লোকদের সামনে তুলে ধরে সচেতনতা তৈরির কাজ করে যেতে থাকেন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ফর্মুলা

প্রথমত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দাবি ছিল, হিন্দুস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। সেই সঙ্গে হিন্দুস্তানে এমন এক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচেষ্টা তারা করে আসছিলেন, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং স্বাধীন দেশে কোনো সম্প্রদায় কারও কোনো ক্ষতিসাধান করবে না। এজন্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সাহারানপুরে অনুষ্ঠিত তাদের সম্মেলনে মুসলিম লীগের প্রণীত ভারত ভাগের নীতির মোকাবিলায় বেশ ভারসাম্যপূর্ণ ফর্মুলা পেশ করে, যেটি লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তের পেশকৃত ফর্মুলার পূর্ণতা ছিল। ইতিহাসে তা মাদানি ফর্মুলা নামে পরিচিত।

দীর্ঘ সাধনা ও রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত ভারতবর্ষের আজাদিকে সামনে রেখে এবং মুসলিম লীগের আত্মঘাতী হিন্দু ও মুসলিমের জন্য পৃথক রাষ্ট্র তৈরির প্রস্তাবের বিপরীতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ যে ফর্মুলা পেশ করে তাতে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল–

১. স্বাধীন হিন্দুস্তানে মুসলমানগণ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন হবে এবং তারা কারও কোনো এমন আইন গ্রহণ করবে না, যে আইনের ভিত্তি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার ওপর নয়। অর্থাৎ, মুসলমানরা সর্বদিক থেকে স্বাধীনতা লাভ করবে। এমন কোনো আইন তারা মেনে নেবে না, যা তাদের পূর্ণ স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করবে।

. বিস্তারিত জানতে দেখুন *উলামায়ে হক* দ্বিতীয় খণ্ড

২. স্বাধীন হিন্দুস্তানের প্রতিটি প্রদেশ পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত হবে। সকলের একটি মাত্র কেন্দ্র থাকবে। আর কেন্দ্র কেবল সে সকল আইন বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে, সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যা কেন্দ্রকে প্রধান করা হবে।

৩. কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যার অনুপাত হবে এভাবে, মুসলমান ৪৫, হিন্দু ৪৫ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ১০।

৪. কোনো বিল বা আইন যদি ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থি হওয়ার কারণে মুসলিম নীতিনির্ধারকদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সদস্য গ্রহণ না করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার তা পাশ করতে পারবে না।

৫. এমন একটি সুপ্রিমকোর্ট গঠন করা হবে, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম বিচারকের সংখ্যা সমান থাকবে।[১৭৮]

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রস্তাবিত এই ফর্মুলা যদি মেনে নেওয়া হতো, তাহলে ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানে মুসলমানদের অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধিত হতো। কেননা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে প্রতিটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হতো। যেমন, অবিভক্ত পাঞ্জাব, বাংলা, ইয়াগিস্তানের সীমান্ত, সিন্ধু ও অন্যান্য প্রদেশ যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় শাসনে মুসলমান এই পরিমাণ প্রভাবশালী হতো যে, তাদের ইচ্ছা ও দাবি-দাওয়ার বিপরীতে কোনো আইন পাশ হতে পারত না। সেই সাথে এই ফর্মুলা বাস্তবায়নের ফলে যদি কোনো প্রদেশের মুসলিম নাগরিক অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা নিগৃহীত হতো তাহলে পরবর্তী সময় অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব হতো।

মোটকথা, মাদানি ফর্মুলা সর্বদিক বিবেচনায় মুসলমানদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর ছিল। কিন্তু দলীয় বিভক্তি, রাজনৈতিক জিঘাংসাপূর্ণ মনোভাব, অধার্মিক নেতৃত্ব, ক্ষমতার লিপ্সা ও হিন্দুজমের এমন ভূত মাথায় চেপে বসল যে, সমস্ত পরিণাম ও পরিণতির ব্যাপারে বেখবর হয়ে মুসলিম সমাজের বিশেষ ও সাধারণ সকল শ্রেণির নাগরিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকেই সফলতা জ্ঞান করতে লাগল। এমনকি অনেক প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলেমও কলকাতায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম লীগের জন্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করে দেয়।

নির্বাচনের ফলাফল

যে পরিবেশে ৪৫-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে ফলাফল কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় ছিল। ৮৪% আসন মুসলিম লীগ লাভ করে এবং মাত্র ১৬% মুসলিম পার্লামেন্ট বোর্ডের হাতে আসে। ভোটের হিসাবে মুসলিম লীগ পেয়েছে ৬০% ভোট এবং ৪০% পেয়েছে মুসলিম পার্লামেন্ট বোর্ড। তথাপিও

১৭৮. জমিয়তে উলামা ক্যায়া হ্যায়? : ২/২৭৩

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জোটদল মুসলিম পার্লামেন্ট বোর্ড যে পরিমাণ আসন ও ভোট পেয়েছে তা প্রত্যাশার অধিক ছিল।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ সাফল্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়ে যায়।[১৭৯]

ব্রিটিশ সরকার তখন হিন্দুস্তানের উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ লুফে নেয়। ব্রিটেন থেকে তিন জন মন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল হিন্দুস্তানে প্রেরণ করে। তারা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে হিন্দুস্তানের আগামী দিনের নতুন প্ল্যান তৈরি করবে। ইতিহাসে এই প্রতিনিধি দল ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী মিশন নামে পরিচিত। তারা এসে হিন্দুস্তানের সকল রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সাতটি পয়েন্টে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে। সাতটি পয়েন্টের অধিকাংশ ছিল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ঘোষিত ফর্মুলার অনুকূল এবং মুসলিম লীগের দাবিকৃত মুসলমানদের পৃথক মুসলিম স্টেট পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব বিভিন্ন কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ক্যাবিনেট মিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে একটি অখণ্ড অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মুসলিম লীগের ঘোর বিরোধিতার ফলে ক্যাবিনেট মিশনের এই পদক্ষেপ অঙ্কুরেই বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে মুসলিম লীগ যখন ক্যাবিনেট মিশনের সাত প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৬ আগস্টকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে, তখন ভারতীয় ভাইসরয় কংগ্রেসকে হিন্দুস্তানের অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানায়। সেমতে কংগ্রেস সভাপতি মিস্টার জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৮০]

প্রথমে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে শরিক ছিল না। পরবর্তী সময় ১৯৪৬-এর ২৪ মে মুসলিম লীগ অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের সাত দফা প্রস্তাবনা মেনে নেয়।[১৮১]

লাশের স্তূপ মাড়িয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারত ভাগের প্রস্তাব নাকচ করে দিলো, তখন মুসলিম লীগ তা মেনে নিয়ে হুকুমতে অংশগ্রহণ করা ছিল মুসলিম লীগের একটি কৌশল। একদিকে তারা ১৬ আগস্টকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে;[১৮২]

১৭৯. উলামায়ে হক : ২/১১

১৮০. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১৬৭

১৮১. তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ : ১৬৮

১৮২. এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ডাক দিয়ে মুসলিম লীগের প্রধান নেতা মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা দেন যে, তিনি বিভক্ত ভারত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারত চান। বিভক্ত ভারত বলতে মুসলমানদের জন্য পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি।

যা হিন্দুস্তানের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে আগুন লাগিয়ে দেয়। কেবল কলকাতা শহরেই কয়েক হাজার হিন্দু ও মুসলিম নিহত হয়।[১৮৩] জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলা প্রদেশের নোয়াখালিতে মুসলিম লীগের সমর্থকরা নিরপরাধ বহু হিন্দুকে হত্যা করে। এর ফলে গোটা রাষ্ট্রে কঠিন দাঙ্গা বাঁধে। গড় মুকেশর এলাকায় অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করা হয়। মোটকথা, এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভারতের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রীতি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং জনসাধারণ এর থেকে এই বার্তা পায় যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলিম একসাথে থাকা যাবে না।

অপরদিকে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে অংশগ্রহণ করে এবং পার্লামেন্ট মেম্বাররা রাষ্ট্রীয় কাজে একের পর এক বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে থাকে। অন্তর্বর্তী সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্তে তারা ভাগড়া দিতে থাকে। দেখা যাচ্ছে, পার্লামেন্টে কংগ্রেস যে দাবি পেশ করছে মুসলিম লীগ কোনো প্রকার বোঝাপড়া ছাড়াই তার বিপক্ষে ভোট দিচ্ছে এবং নিজেরা এমন এমন প্রস্তাব ও দাবি-দাওয়া রাখছে, যা সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত। এর ফলে কংগ্রেস নেতাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এক হয়ে কোনোভাবেই পার্লামেন্ট ও হুকুমত পরিচালনা সম্ভব নয়।[১৮৪]

মুসলিম লীগ সর্বস্তরের লোকদের মাঝে ভারত বিভক্তির ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। সাধারণ নাগরিক তো রয়েছেই, বড় বড় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যারা আগে ভারত ভাগের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন এবং বলতেন, যদি ভারত ভাগ হয় তাহলে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে ভাগ হতে হবে; তারাও তখন ভারত ভাগের পক্ষে জোরালো মত দিতে লাগলেন। কারণ, তাদের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম লীগ যদি এখানে থাকে তাহলে কংগ্রেস রাষ্ট্রশাসনে কখনোই সফল হবে না। ফলে ভারত ভাগের ব্যাপারটি তখন চরম আকার ধারণ করে এবং সর্বত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এমন এক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও এর সমচিন্তার দলগুলো পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে ভারত ভাগ ও মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে যেতে থাকেন। মুসলিম লীগের অপরিণামদর্শী নেতৃত্ব তাদের চিন্তাধারায় সামান্য পরিবর্তন আনতেও সফল হয়নি। তথাপিও তাদের জোর প্রচেষ্টা ও অব্যাহত প্রচার-প্রচারণার ফলে আলেমদের অখণ্ড ভারতের দাবি প্রতিধ্বনিত হয়ে সংগীত ভবনে সামান্য পাখির আওয়াজের চেয়ে বেশি কোনো গুরুত্ব পেল না।

[১৮৩]. ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ড গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস নামে পরিচিত

[১৮৪]. তারিখে উলামায়ে হিন্দ : ১৬৮

আলেমদের শঙ্কা

আলেমগণ তাদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কুফল ও অশুভ পরিণতি দেখতে পারছিলেন। তাদের আশঙ্কা ছিল–

১. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে কোটি কোটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে হিন্দুস্তানে রয়ে যাবে তাদের এক ঘোর অনিশ্চয়তা থাকতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দয়া ও কৃপায় জীবনযাপন করতে হবে।

২. যে সকল মুসলমান হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে পাকিস্তান চলে যাবে, তারা সেখানে বসবাস করা সত্ত্বেও দেশীয় ও বংশীয় বৈশিষ্ট্য থেকে বের হতে পারবে না।

৩. পাকিস্তান গঠনের পর সেখানে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে তা নিছক মরীচিকা ও ধোঁকা বই কিছু নয়। কারণ, মুসলিম লীগের নেতৃত্ব এমন কিছু অধার্মিক ও ধর্মীয় চেতনাহীন ব্যক্তির হাতে ছিল, যাদের ব্যক্তিজীবনেই ইসলামের নাম-নিশানা ছিল না। কেবল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লিপ্সায় তারা ইসলামের নাম ব্যবহার করছে।

৪. প্রস্তাবিত পাকিস্তানের দুই প্রধান অংশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব এত অধিক যে, উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও একতা বাহ্যত সম্ভব নয়। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের মাঝে খুন-খারাপির প্রবল আশঙ্কা ছিল।

৫. হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত দিল্লি ও পশ্চিম ইউপিতে অসংখ্য মাদরাসা, মসজিদ ও মুসলমানদের জন্য ওয়াকফকৃত জমি-জমা ছিল, যা বিনষ্ট ও বিরান হয়ে যাওয়ার প্রবল শঙ্কা ছিল।

এ সকল কারণে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করছিলেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত তাদের মজলিসে আমেলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কঠিন সমালোচনা করে। কংগ্রেস প্রথম থেকে ভারত ভাগের বিরোধিতা করে এলেও শেষে এসে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। এ ব্যাপারে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রদান করে। পরবর্তী সময় ১৯৪৭-এর জুন মাসে তারা এই ঘোষণা জারি করে যে, হিন্দুস্তানকে বিভক্ত করা হিন্দুস্তানের জনগণের জন্য সামগ্রিকভাবে এবং মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কঠিন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা ও উপলব্ধি করে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ পুনরায় হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সতর্ক করছে যে, ভারত ভাগ হলে মুসলিম সম্প্রদায় চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ধ্বংসের কারণ সাব্যস্ত হবে।[১৮৫]

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নেশায় তারা এতটাই মত্ত হয়ে পড়ে যে, সচেতন আলেমসমাজের কথায় কর্ণপাত করার সময়ও তাদের হয়নি।

[১৮৫]. উলামায়ে হক : ২/৫৩৭

অষ্টম অধ্যায়

গৃহ পুড়ে গেল গৃহেরই প্রদীপে

- ভারত ভাগের ঘোষণা
- কংগ্রেস ভুলে যায় তাদের ইতিহাস
- সংগীত ভবনে পাখির আওয়াজ
- ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তের ফোয়ারা
- কে নেবে ছয় লক্ষ মানুষের হত্যার দায়?
- মুসলমানদের দুর্দিনে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ.-এর ভূমিকা
- মুজাহিদে মিল্লাতের আত্মত্যাগ
- ভারত ভাগ পরবর্তী হিন্দুস্তানের আলেমসমাজ

ভারত ভাগের ঘোষণা

অবস্থা এতটাই নাজুক ও সঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমানের মাঝে পরস্পরে এতটাই ঘৃণা ও জিঘাংসা জন্মেছিল যে, কেউই রাষ্ট্রের নির্মম পরিণতির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিল না; বরং সকলে নিজেদের স্বার্থ হাসিল এবং নিজেদের চাওয়া মতো ক্ষমতার মালিক হওয়ার লিপ্সা হৃদয়ে পোষণ করতে থাকে। মুসলিম লীগের মুসলমানরা অন্যদের বাদ দিয়ে নিজেরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে চাচ্ছিল। এমনিভাবে উগ্রপন্থি হিন্দু নেতারা যেমন, রাজগোপাল, সর্দার পাটেল ও পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ বিশেষভাবে দ্রুত একক হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তার ক্ষমতালাভের জন্য তোরজোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

হিন্দুস্তান দুই ভাগ করে দেওয়া তো ব্রিটিশদের পুরোনো স্বপ্নই ছিল। অবশেষে যখন উগ্রপন্থি হিন্দু ও মুসলিম লীগ নিজেরাই হিন্দুস্তান ভাগের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, তখন ব্রিটিশ সরকার তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মোক্ষম সময় পেয়ে গেল। সেমতে ১৯৪৭-এর ৩ জুন ইতিহাসের সেই কলঙ্কজনক তারিখ; যখন হিন্দুস্তানের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন হিন্দুস্তানের আজাদির মর্মে একটি বিশদ ঘোষণা জারি করে, যেখানে স্পষ্টত ভারত ভাগের প্রস্তাবনাকে মঞ্জুর করা হয়। সেই সাথে কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশও হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে বিভক্তির ঘোষণা দিয়ে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের কফিনে শেষ পেরেক মেরে দেয়।[১৮৮]

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের চুক্তি স্বাক্ষর

গভর্নর লর্ড মাউন্টব্যাটেন আগ থেকেই কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তথা মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর করোটিতে এ কথা ঢুকিয়ে দেয় যে, এ মুহূর্তে ভারত ভাগ করা ছাড়া কল্যাণের আর কোনো পথ খোলা নেই। অপরদিকে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এতটাই মত্ত হয়ে পড়ে যে, তাদের মস্তিষ্ক থেকে এর ভয়াবহ ক্ষতি ও অপরিণামদর্শিতার কথা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। তারা কেবল একটা পাকিস্তান চায়। সেটা ছোট হোক অথবা বড়-এ নিয়ে তাদের মোটেও ভ্রূক্ষেপ নেই। মূলত ভারত ভাগ হয়ে

---

১৮৮. উলামায়ে হক : ২/৫৯৬

পাকিস্তানের জন্ম হলে তারা পার্লামেন্ট গঠন করে ক্ষমতায় বসতে পারবে, কেবল এটুকু প্রাপ্তির অন্ধে তারা বহু শতাব্দীর কান্না ও নির্মমতাকে বেমালুম ভুলে যায়।

জুনের ৩ তারিখ ভারত বিভক্তির প্রস্তাবনা মঞ্জুর করার কয়েকদিন পর ৯ তারিখ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুসলিম লীগ তড়িগড়ি ভারত ভাগের প্রস্তাবনা মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু তখন মুসলিমের লীগ এই সামান্য চিন্তাটুকু করেনি, কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করার পর তাদের পাকিস্তানের নামে যেটুকু ভূমি দেওয়া হচ্ছে তা তাদের ধারণার চেয়েও অনেক কম। অথচ ১৯৪৪ সালে এই সিদ্ধান্তকে তারা ছালবাকল ও ঝুটা বলে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এরপর ১৪ জুন ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস স্মরণকালের এক বৃহত্তম কনফারেন্সের আয়োজন করে; যেখানে ভোটের মাধ্যমে ভারত বিভাজনের প্রস্তাবনাকে গৃহীত করে রাষ্ট্রের বিভক্তির চূড়ান্ত রেখা টেনে দেওয়া হয়।[১৬৬]

কংগ্রেস ভুলে গেল তার ইতিহাস

কংগ্রেসের প্রথমসারির নেতৃবৃন্দের বিশেষ একটি অংশের নেতৃত্ব ছিল সর্দার প্যাটেলের হাতে। এই অংশটি ভারতের শাসনকার্য পরিচালনায় মুসলমানদের অংশগ্রহণের বিরোধী ছিল এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের সাথে মিলে পার্লামেন্ট গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের এই অংশটি বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর করোটিতে তাদের অনুরূপ সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা বদ্ধমূল করতে সফল হয়। যার ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস তাদের দীর্ঘদিনের চিন্তাধারা থেকে সরে এসে মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন জানায় এবং ভারত বিভাজনের পক্ষে সোচ্চার হয়।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের ১৯৪৭-এর ১৪ জুন সমাবেশ সম্পর্কে লেখেন–

> আমি কংগ্রেসের বহু বৈঠক ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু আজ অবধি এমন আশ্চর্য কোনো সমাবেশে আমি অংশগ্রহণ করিনি। যে কংগ্রেস সর্বদা রাষ্ট্রের আজাদি ও অখণ্ডতার জন্য জীবন বাজি রেখেছে, সেই কংগ্রেস এখন ভারত ভাগের পক্ষে কথা বলছে।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আরও লেখেন–

> কংগ্রেসের এমন ভয়াবহ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আমার পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। আমি আমার বক্তব্যে পরিষ্কার তাদের এই কথা জানিয়ে দিয়েছি যে, ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত বাস্তবতার নিরীখে খুবই দুঃখজনক এবং

১৬৬. উলামায়ে হক : ২/৫২১

> দীর্ঘদিন চলে আসা ঘটনাপরম্পরার মর্মান্তিক সমাপ্তি। ভারত ভাগের ফলে একটি স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমি আমার অক্ষমতার কারণে সর্বোচ্চ এতটুকু বলতে পেরেছি, আমি এর থেকে বাঁচার সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।[১৬৭]

বাস্তবতা হচ্ছে, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের এই বক্তব্য পরাজয়ের স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কিছুই না।

সংগীত ভবনে পাখির কিচিরমিচির

কংগ্রেসের অনেক নেতাই ভারত বিভাজনের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি তখন এতটাই ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল যে, তারা একপ্রকার বোবা বনে গিয়েছিলেন, কারও মুখ থেকে কোনো টু শব্দটি পর্যন্ত বের হচ্ছিল না। তারা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা কী করবেন! সকলের নীরবতার মাঝে শুধু একটি দরাজ কণ্ঠ কংগ্রেসের গ্রহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বেজে উঠেছিল। তিনি মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ.। সেদিন কংগ্রেসের ভরা সম্মেলনে দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন–

> যে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ভারত ভাগের প্রস্তাব গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমি আমার নেতৃবৃন্দকে পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে কেবল এতটুকু বলব, ভারত ভাগের পরিণতি বর্তমান পরিস্থিতির চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ হবে। আজ যদি কংগ্রেসের এই সম্মেলনে ভারত ভাগের স্কিম মঞ্জুর করা হয়, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে, আমরা আমাদের পূর্ব ইতিহাস মুছে দেওয়া এবং চিরদিনের জন্য নিজেদের আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর ছুরি চালানো। সেই সাথে মুসলিম লীগের আবিষ্কৃত দ্বিজাতি তত্ত্বের সামনে মাথা নত করা।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, সেদিন কংগ্রেসের সম্মেলনে মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ.-এর বক্তব্যে কেউ সমর্থন জানায়নি। উচ্চ কোলাহলপূর্ণ সংগীত ভবনে পাখির সামান্য কিচিরমিচি যেমন অর্থহীন, তা কারও কর্ণগোচর হয় না, মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ.-এর বক্তব্যও তেমন গুরুত্বহীন ও অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয়েছিল তাদের কাছে।

তবে সেদিন মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ.-এর এই বক্তব্য সত্যপন্থি আলেমসমাজ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের লাজ রক্ষা করেছে। মুসলমানদের দ্বীন, তাহজিব-তামাদ্দুন ও আগামী দিনের অস্তিত্ব রক্ষার্থে দ্বিজাতি তত্ত্ব ও ভারত বিভাজনের বিরুদ্ধে আলেমসমাজ নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এমনকি দ্বিজাতি তত্ত্ব ও ভারত ভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা কংগ্রেসও যখন তাদের দীর্ঘদিনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে তখনও আলেমসমাজ নিজেদের মতের ওপর সুদৃঢ় ছিলেন।

১৬৭. ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম : ২৮৪

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক

মুসলিম লীগ প্রস্তাবিত পাকিস্তানের মানচিত্রে সে সমস্ত অঞ্চল ও প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলোতে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেমন–বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, ইয়াগিস্তান ও অন্যান্য প্রদেশ। কংগ্রেস যখন দেখল, ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাজনের প্রস্তাব মেনে নেবে, তখন তারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্তির জন্য নতুন প্রস্তাব পেশ করল। অর্থাৎ, বাংলা ও পাঞ্জাবের যে অংশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অংশটি হিন্দুস্তানে এবং অপর যে অংশে মুসলমান বেশি সে অংশটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাল। সেমতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে দুই ভাগ করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করে দেওয়া হলো। এর ভিত্তিতে মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের যে অংশটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পেয়েছে তা ছিল পূর্ণ প্রদেশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড দেখে আমরা হয়রান হয়ে যাই, কীভাবে তারা এত বড় একটি ক্ষতি এত সহজে মেনে নিলেন।

ভারত ভাগে লাভবান কারা?

ভারত ভাগে হিন্দু সম্প্রদায় অস্বাভাবিক লাভবান এবং বিপরীতে মুসলিম সম্প্রদায় অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। মুসলমানরা রাষ্ট্রের সামান্য ভূখণ্ডের মালিক হয়েছে। আর বাকি পুরোটাই হিন্দুস্তানের অধীনে চলে গেছে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ফর্মুলায় ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও বহুসংখ্যক মুসলমান হিন্দুস্তানে রয়ে যায়। কিন্তু সেখানে মুসলমানদের কোনো ক্ষমতায়ণ ছিল না। সম্পূর্ণ হুকুমত হিন্দুদের হাতে অর্পিত হয়। তারা তাদের মনমতো শাসনকার্য পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে কয়েক হাজার বছর পর হিন্দুদের সামনে এমন এক জাঁকজমকপূর্ণ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ তৈরি হয়, যা কখনো তাদের কল্পনায়ও ছিল না। হিন্দুস্তানের বড় বড় শহর, বিরাট বিরাট বন্দর তাদের অংশে আসে। মুসলমানদের হাতে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব সকল স্থাপত্যে ঘেরা অসংখ্য শহর ও প্রদেশ হিন্দুদের অধিকারে চলে যায়। অসংখ্য খনিজ সম্পদ এবং রেলওয়ের বিশাল অংশ হিন্দুস্তানের ভাগে পড়ে।[৯৯]

এ তো ছিল ভারত ভাগকালীন হিসাব-নিকাশ। কিন্তু পরবর্তী সময় পাকিস্তানের দুটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান একসাথে শাসনকার্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের এ দুটি অংশের মাঝে এত বড়ো ব্যবধান ছিল যে, উভয় অংশের ঐক্য এবং একই রাষ্ট্র হিসেবে বেশিদিন স্থায়ী না থাকার আশঙ্কা সহজেই অনুমেয় ছিল। বাস্তবেও হয়েছে তাই। মাত্র তিন দশক অতিক্রম না করতেই মিস্টার জিন্নাহর গঠিত পাকিস্তানের পূর্বাংশ

৯৯. উলামায়ে হক : ২/৫২৬

আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয়ে পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর দ্বারা পাকিস্তান আন্দোলনের অদূরদর্শিতা সকল প্রজ্ঞাদীপ্ত মানুষের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

উম্মাহর ঐক্য ভেঙে খানখান

ভারত ভাগের পূর্বে প্রায় দশ কোটি মুসলমান ছিল। এরমধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটির কাছাকাছি। বাকি পাঁচ কোটি ছিল পুরো রাষ্ট্রে ছড়ানো ছিটানো। পাকিস্তান তৈরির পর হত্যা, লুটতরাজ ও বসতি, জমি-জমা এসব কিছু অন্যত্র স্থানান্তরের ঝামেলার কারণে চার থেকে সাড়ে চার কোটি মুসলমান হিন্দুস্তানে রয়ে যায়। তারা নিজেদের আবাসভূমি রেখে পাকিস্তান চলে যাওয়া সংগত মনে করেনি। ফলে ভারত বিভাজনের ফয়সালা মুসমানদের জাতিগত ঐক্য ও একতাকে ভেঙে খানখান করে দিয়েছে এবং তাদের সম্মিলিত শক্তিকে তিন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে।

আজাদির শানাই বাজার প্রাক্কালে

আজাদির চূড়ান্ত ও নিয়মতান্ত্রিক ঘোষণার পূর্বে ভারত ভাগের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়ে গিয়েছিল। এজন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টবেটেন ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের এবং ১৪ থেকে ১৫ আগস্ট মধ্যবর্তী রাতে হিন্দুস্তানের আজাদির নিয়মতান্ত্রিক ঘোষণা দেয়।

এরমধ্য দিয়ে নব্বই বছরের দাসত্বের পর দেশবাসী আজাদির সূর্যোদয় দেখতে পায়। এজন্য সকলের হৃদয়-মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাওয়াটা স্বভাবজাত ছিল। কিন্তু সাথে সাথে এক ভয়ানক আশঙ্কা ও অন্তর শীতল করা ভয়ও জেঁকে বসেছিল।

সেদিন দারুল হুকুমত দিল্লির অবস্থা কী ছিল মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন–

গোটা শহর আনন্দ-উৎসবের কোলাহলে মেতে ওঠে। ক্ষণিকের জন্য দেশ ভাগের অনুভূতি তাদের অন্তর থেকে উবে গিয়েছিল। শহর ও আশপাশের এলাকা থেকে লাখ লাখ মানুষ আজাদিকে স্বাগত জানাতে এবং বরণ করার জন্য সমবেত হয়। সন্ধ্যা চারটায় আজাদ হিন্দুস্তানের পতাকা উত্তোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। আগস্টের তীব্র গরম মাথায় করেও লাখ লাখ মানুষ দিল্লির রাস্তায় সমবেত হয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই প্রচণ্ড তাপদগ্ধ গরম আবহাওয়ায় বসে তারা ইতিহাসের রাজসাক্ষী হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। আনন্দের আতিশয্যে এসব তাদের নিকট সহনীয় হয়ে গিয়েছিল। খুশির তীব্রতা গরমের তীব্রতাকে ঢেকে নিয়েছিল। কিন্তু দেশবাসীর এই আনন্দ-উৎসব ৪৮ ঘণ্টার

অধিক স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় দিন থেকেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একের পর এক সংবাদে দিল্লির আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়।'[১৮০]

ফিনকি দিয়ে ছুটে রক্তের ফোয়ারা

আজাদির শানাই তখনও থামেনি, এর আগেই পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশে আবাদি অদল-বদল ও স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমান তাদের হিন্দু ও শিখ প্রতিবেশীদের ওপর গণহত্যা চালায়। অপরদিকে হিন্দু ও শিখরা গণহত্যা চালায় পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের ওপর। পশ্চিম থেকে আসা ট্রেনগুলোতে হিন্দু ও শিখদের এবং পূর্ব থেকে আসা ট্রেনগুলোতে মুসলমানদের লাশের স্তূপ ছিল। দেশ ছেড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমনকারী অসংখ্য কাফেলা পাকড়াও করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করা হয়। মোটকথা, আজাদির ঘোষণা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গণহত্যা, লুটতরাজ, সকল প্রকার জুলুম ও বর্বরতার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। ফলে ১৯৪৭-এর ভারতবর্ষে মানবতা ও মনুষ্যত্ব মুখ থুবড়ে পড়ে।

পণ্ডিত সিন্ধুলালের বর্ণনা মোতাবেক ভারত ভাগের সময় হিন্দু মুসলিমসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের পাঁচ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। প্রচুর ধনসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাজার হাজার নারী ও পুরুষকে জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণে বাধ্য করা হয়। কয়েক মাস পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।[১৮১]

পাঞ্জাব ও বাংলায় হিন্দু শিখদের ওপর মুসলমানদের জুলুমের সংবাদ যখন দিল্লিতে একে একে আসতে থাকে এবং সেখানকার নির্যাতিত লোকজন দিল্লিতে এসে তাদের ওপর চালানো গণহত্যার বয়ান দিতে থাকে, তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে দিল্লি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে তারা মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়। হিন্দুদের বিশেষ প্রশিক্ষিত একদল সন্ত্রাসী যাদের সংখ্যা ছিল আট থেকে নয় শ; তারা একযোগে দিল্লির মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়। হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে।

মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া তৎকালীন দিল্লির চিত্র এভাবে তার লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

> দিল্লিতে সেদিন যা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, কয়েক দিনের দাঙ্গায় কুরুলবাগ, পাহাড়গঞ্জ ও সবজিখণ্ডের সকল মুসলমানকে শহিদ করে দেওয়া হয়। ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট উজাড় করে দেয়। নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। বাচ্চাদের জবাই করা হয়। নীল আকাশের নিচে এবং জমিনের ওপর এমন সব কর্মকাণ্ড তারা ঘটিয়েছে,

[১৮০]. ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম : ২৯৭

[১৮১]. উলামায়ে হক : ২/৫৬১

> যা দিল্লি কখনো চোখে দেখেনি। ইতিহাসের এই রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি দিল্লির কপালে চিরদিন কলঙ্কের তিলক হয়ে থাকবে।
>
> কুরুলবাগ, পাহাড়গঞ্জ ও সবজিখণ্ড আয়তনে একেকটি শহরের মতো ছিল। কমবেশি দেড় লাখ মুসলমানের বসবাস ছিল এখানে। অনেক বড় ধনাঢ্য ও বংশীয় ব্যক্তিবর্গ ছিল, যাদের স্ত্রী ও কন্যারা সর্বদা বিপুল আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করেছে। দিল্লির এই দাঙ্গা তাদের এমন নির্মম পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা শোনার জন্য পাথরের কলিজা প্রয়োজন।
>
> ভয়াবহ এই দাঙ্গার শিকার হওয়া লোকজন ঘর-বাড়ি হারিয়ে, সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে যে যার মতো জানে পালিয়ে গেছে। মা জানে না সন্তান কোথায়, পিতা জানে না পরিবারের খবর, ভাই তার বোন সম্পর্কে উদাসীন; এমন নিষ্পেষিত সময়ে যারা বেঁচে ছিল, তারা হিজাব-নিকাবে মুখ ঢেকে বাড়ি ছেড়ে প্রাণ রক্ষার্থে রাস্তায় নেমে পড়ে। আর রাস্তায় আসতেই গুলি ও পাথর তাদের স্বাগত জানায়। অনেকে পথেই মারা পড়ে। আর যারা বেঁচে ছিল তারা কোনো রকমে দিল্লির জামে মসজিদের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু মসজিদে আগ থেকেই লোকে লোকারণ্য ছিল। প্রচণ্ড ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে লোকেরা লালকেল্লার দিকে ছুটে যায়। দিল্লির জামে মসজিদ থেকে পুরাতন কেল্লা অথবা মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। কিন্তু এই রাস্তাটি অনিরাপদ হলেও পথে কেউ কোনো হামলা করছিল না। তারা হয়তো চাচ্ছিল, মুসলমানরা ঘরদোর, জায়গা-জমি রেখে পাকিস্তান পালিয়ে যাক।
>
> শুধু এক পুরাতন কেল্লায় লক্ষাধিক নিপীড়িত মুসলমান সমবেত হয়। কেল্লার ভেতরেই তারা থাকা-খাওয়া এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারে। ফলে একপর্যায়ে উৎকট দুর্গন্ধে শ্বাস গ্রহণও তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এত এত মানুষের পানি পানের জন্য একটি মাত্র নল ছিল। ভেতরে খাদ্য জোগান কঠিন হয়ে পড়ে। এদিকে কেল্লার বাইরে গেলে প্রাণনাশের শঙ্কা ছিল। যে কেল্লা ছিল আশ্রয়দানকারী, কিছুদিন আগেও যা ছিল সম্পদ ও ঐশ্বর্যে ভরপুর, তা আজ রিক্ত ও মসিবতের কেল্লায় রূপান্তরিত হলো। ক্ষুধা ও পিপাসার নিদারুণ যন্ত্রণায় নিরুপায় মুসলমানদের জীবন মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল। তাদের মধ্যে যারা দেহমনে শক্ত-সামর্থ্য ছিল, কেবল তারাই বেঁচে ছিল। বাকিরা কেল্লার ভেতর মরে পড়ে থাকে।[১৮২]

স্বয়ং সরকার ও প্রশাসনই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে প্রভাবিত ছিল। দেশ ভাগের মতো সামরিক বাহিনীকেও হিন্দুস্তান পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত করার ফলে তাদের পরস্পরের মাঝে ঘৃণা, জিঘাংসা ও শত্রুতার চারা রোপণ করে

[১৮২]. উলামায়ে হক : ২/৫৮৫

দেওয়া হয়েছিল। এজন্য চেষ্টা করেও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতার্থে সেদিনকার পরিস্থিতি এতটাই নাজুক ও ভয়াবহ ছিল, যা আজ কল্পনা করাই দুষ্কর।

ছয় লাখ মানুষ হত্যার দায় কার?

দিল্লিতে নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজের পেছনে কারণ ছিল। দেশ ভাগের সাথে সাথে বসতি ও জায়গা-জমির অদল-বদলের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। আর এর পেছনে বড় কারণ হিসেবে ছিল পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকে হিন্দু ও মুসলিম দুই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গি।

এ দুটি প্রদেশ হিন্দু-মুসলিম হিসেবে ভাগ না করে যদি বলে দেওয়া হতো, উভয়টি প্রদেশ হিন্দুস্তানের অংশে থাকবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম, ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের এক সমান অধিকার থাকবে, তাহলে তাদের স্থানান্তরের প্রসঙ্গ আসত না আর এই রক্তক্ষয়ী হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হতো না।

এজন্য ইতিহাসের আলোকে প্রত্যেক সত্য ও ন্যায়পন্থি ব্যক্তি অকপটে এই কথা স্বীকার করে যে, পাঞ্জাব ও দিল্লির গণহত্যার জন্য প্রধানত দায়ী হচ্ছে মুসলিম লীগ। কারণ, তারাই সর্বপ্রথম ভারত ভাগের সুর তুলেছে এবং তা বাস্তবায়নে আদাজল খেয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে ময়দান গরম করেছে। দ্বিতীয়ত দায়ী হচ্ছে ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস। তারা যখন দেখল, ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত পাকিস্তান তৈরির দাবি মেনে নেবে, তখন তারা পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকেও হিন্দু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে দুই অংশে বিভক্তির দাবি করে বসে। ফলে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলের দাবিই মেনে নিয়ে অখণ্ড ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়।

ভারত ভাগের পর হিন্দুস্তানের অনেক মুসলমান পাকিস্তানে, পাকিস্তানের অনেক হিন্দু হিন্দুস্তানে, পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বসবাসরত হিন্দুরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায়, এমনিভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বসবাসরত মুসলমানরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এবং বাংলায় হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানরা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এমনিভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দুরা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে চলে যেতে থাকে। মূলত এই আবাস বদল ও এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরের ফলেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরি হয় এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলিম হতাহত হয়।

যদি মুসলিম লীগ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের দাবি না জানাত আর কংগ্রেস ও আমাদের দেশপ্রেমিক ভাইয়েরা একটু সতর্কতা আর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে রয়েসয়ে কাজ করত, তাহলে ১৯৪৭-এর দাঙ্গা ও গণহত্যা এড়ানো সম্ভব ছিল।

ভারত ভাগের পর হিন্দুস্তানের মুসলমানরা চরম বিপাকে পড়ে। তাদের নেতৃত্ব দেওয়া এবং তাদের বিপদে এগিয়ে আসার মতো আর কেউ বাকি রইল না। একদিকে মুসলিম লীগের সকল নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের একা ফেলে পাকিস্তানে চলে যায়, অপরদিকে উগ্রপন্থি হিন্দুদের হত্যা-নিপীড়ন বেড়ে যায়। এমন কঠিনতর পরিস্থিতিতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সাহবানুল হিন্দ মাওলানা আহমদ সাইদ, মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের একত্রিত করে রাখা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তাদের কৃপা ও অনুগ্রহের মূল্য হিন্দুস্তানের মুসলিম সম্প্রদায় কখনোই আদায় করতে পারবে না।

বিশেষ করে মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেই ক্রান্তিলগ্নে যদি হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ. না থাকতেন, তাহলে আজ দিল্লিতে মুসলিম আবাদি, ইসলামি স্থাপত্য ও নিদর্শন এসবের কোনো অস্তিত্বই বাকি থাকত না। ৪৭-এর প্রলয়ংকারী ঝড়ে উড়ে যেত সব। উম্মাহ দরদি এই মুজাহিদে মিল্লাত সেই ঝড়ের সামনে শক্তিশালী রাডার হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরুকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লির বিপদগ্রস্ত ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য জান-প্রাণ প্রচেষ্টা চালান এবং সর্দার প্যাটেলের মতো লৌহমানব, হিন্দুবাদী নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে গৃহহীনদের পুনরায় নিজেদের ভিটেমাটিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

৪৭-এর দাঙ্গা ও গণহত্যা বন্ধের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে ভূমিকা পালন করেছেন তা মূলত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পূর্বসূরি আলেমদের ইখলাস ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এমনিভাবে দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মেওয়াতে প্রায় তিন লাখ মুসলমানকে তাদের আবাদিতে বহাল রাখতে মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ. প্রধান ভূমিকা পালন করেন। অন্যথায় উগ্র হিন্দুরা মেওয়াতের মুসলমানদের জোরপূর্বক তাদের বসতি ছাড়তে অথবা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করার প্ল্যান সাজিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ.-এর প্রচেষ্টার কারণে তারা তাদের প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এমনিভাবে পির ও বুজুর্গানে দ্বীনের দরগাহ যেমন, খাজা মঈনুদ্দিন আজমেরি, খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি ও সারহিন্দ শরিফের দরগাহ দাঙ্গার আগুন থেকে বাঁচাতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। মহান আল্লাহ তার নিঃস্বার্থ খেদমতের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

সে সময় আলেমসমাজ কীভাবে এই কঠিন কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন তা শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.-এর একটি ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। স্বাধীনতার পর দাঙ্গা, হত্যা ও লুটতরাজ চলাকালীন তিনি দেওবন্দের জামে মসজিদে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন–

আজ তোমাদের মনে যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা জেঁকে বসেছে তা কল্পনা করতেও আমার লজ্জা করছে। তোমরা ঘরে বসে থাকলেও ভয় পাও, রাস্তায় বের হলেও ভয় পাও। কীভাবে তোমরা তোমাদের সেই পূর্বসূরিদের উত্তরাধীকারী হবে, যারা একদা একটি ক্ষুদ্র কাফেলা হয়ে শত্রু গিজগিজ প্রতিকূলতায় ভরপুর এই ভারতে পদার্পণ করেছিলেন। আজ তোমরা চার কোটি মুসলমান এই দেশে রয়েছ। ইউপিতে তোমাদের সংখ্যা পঁচাশি লাখের অধিক। তথাপিও তোমরা ভয়ে তটস্থ হয়ে মাথার ওপর পা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছ। শেষমেশ তোমরা কোথায় যাবে? তোমরা কি এমন কোনো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছ, যেখানে খোদার পাকড়াও থেকে নিরাপদ থাকবে এবং মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে? মৃত্যু থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে তোমরা?

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, মৃত্যু ভয় পাওয়ার কোনো বস্তু নয়। একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনো মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাকে ইসলাম সত্যবাদিতার মানদণ্ড সাব্যস্ত করেছে। কাফেরদের সম্বোধন করে কুরআনে কারিম বলেছে–

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মৃত্যু কামনা করো।[১৩৩]

সুতরাং তোমরা যদি ইসলামের সত্যবাদিতার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হও, তাহলে মৃত্যুর ব্যাপারে তোমাদের ভয় অনর্থক। মৃত্যু হচ্ছে একটি সেঁতু, যা প্রেমিককে তার প্রেমাস্পদের নিকট পৌঁছে দেয়। আর ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করা তো মৃত্যু নয়, তা এক নতুন জীবনের সূচনা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

যাকে আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছে তাকে তোমরা মৃত বলো না; বরং সে তো জীবিত। কিন্তু তোমরা (তাদের সেই জীবিত থাকা) উপলব্ধি করতে পারো না।[১৩৪]

এজন্য কাপুরুষতা ও ভয় অন্তর থেকে বের করে দাও। ইসলাম ও কাপুরুষতা এক স্থানে সমবেত হতে পারে না। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে সকল

---

১৩৩. সুরা বাকারা : ৯৪
১৩৪. সুরা বাকারা : ১৫৪

মসিবতের মোকাবিলা করো। নিজেরা কোনো ফাসাদ ও হাঙ্গামার সূচনা করবে না। তবে কোনো ফাসাদ ও হাঙ্গামা যদি তোমাদের ওপর চড়ে বসে, তাহলে প্রথমে বিরুদ্ধবাদীদের শান্ত-শিষ্ঠতার সাথে বোঝাও। যদি তারা না মানে এবং কিছুতেই বিরত না হয়, তাহলে তখন নিরুপায় হয়ে তোমরা শক্তভাবে তাদের প্রতিহত করবে। এমনভাবে প্রতিহত করবে, যেন শৈশবে মায়ের দুধপানের স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

তোমাদের সংখ্যা যতই কম হোক, কখনো পিছু হটবে না। নিজেদের আব্রু ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেবে। এই রাষ্ট্রের তরে তোমরা তোমাদের রক্ত সিঞ্চিত করেছ। ভবিষ্যতেও রক্ত সিঞ্চনের পাক্কা এরাদা রাখো। এটাই রাষ্ট্রের প্রকৃত ওফাদারি। এই রাষ্ট্রে তোমাদেরও সেই পরিমাণ অধিকার রয়েছে, যে পরিমাণ অধিকার অন্যদের রয়েছে। সেই সাথে অন্যদের কাঁধে এই রাষ্ট্রকে সেবাযত্ন ও সুরক্ষার যতটুকু দায়িত্ব বর্তায়, ততটুকু দায়িত্ব তোমাদের কাঁধেও বর্তায়।[১৩৫]

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পয়গাম

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৪৭-এর ২৪ অক্টোবর দিল্লি জামে মসজিদে হাজার হাজার মুসলমানকে সম্বোধন করে বলেন–

আমি আপনাদের সর্বদাই বলে আসছি এবং আজও বলছি, দোটানার রাস্তা ছেড়ে দিন, সন্দেহ ও সংশয় থেকে হাত গুটিয়ে নিন এবং সকল প্রকার অসৎ কর্ম বর্জন করুন। এই তিন ধারী খঞ্জর ওই দুধারী তলোয়ার থকে অধিক ধ্বংসাত্মক, যার বিভীষিকাময় কাহিনি আমি আপনাদের তরুণ-যুবাদের মুখ থেকে শুনেছি। পলায়নপর জিন্দেগি যাকে আপনারা হিজরত বলে নাম দিয়েছেন, তা নিয়েও ভাবুন; তবে নিশ্চয় বুঝে আসবে আপনাদের এই হিজরতের চিন্তা ভুল। নিজেদের নীতি-আদর্শকে সুদৃঢ় করুন। নিজেদের বিষয়ে নিজেরা ভাবতে শিখুন। তারপর দেখুন, আপনারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা কত তাড়াপ্রবণ ছিল। আমি আজও বলে যাচ্ছি এবং সর্বদা বলেই যাব, এই মসজিদের মিনার আপনাদের দিকে তাকিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছে, তোমরা তোমাদের সোনালি ইতিহাসের পাতাগুলো কোথায় হারিয়ে ফেলেছ? এই জমুনার তীরে তোমাদের কাফেলা একদিন ওজু করেছিল; আর আজ তোমরা কি-না এখানে বসবাস করতে ভয় পাচ্ছ! অথচ তোমাদেরই রক্তে গড়ে উঠেছে এই সুবিশাল দিল্লি নগরী।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের মনমানসিকতা পরিবর্তন করুন। কিছুদিন পূর্বে আপনাদের আবেগ-উদ্দীপনা ও চিৎকার-চেঁচামেচি যেমন অনুচিত ছিল, আজ আপনাদের মনে চেপে বসা ভয়, দুশ্চিন্তাও

---

১৩৫. আল-জমিয়ত, জমিয়তে উলামা সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ১১৮

তেমনই অনুচিত। কাপুরুষতা আর মুসলমান এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে না কোনো লোভ-লালসা জেঁকে বসতে পারে আর না কোনো ভয় কাবু করতে পারে তাদের।[১৬৮]

সাতচল্লিশ-পরবর্তী হিন্দুস্তান বিনির্মাণে আলেমদের ভূমিকা

আজাদির পর আলেমসমাজ বিশেষ করে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ. প্রথমে এমন একটি সংবিধান প্রণয়নের দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করেন, যে সংবিধানে হিন্দুস্তানের সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা ও পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। তারা তাদের এই উদ্দেশ্যে শতভাগ সফল হন। ক্ষমতাশীন কংগ্রেসে তৎকালীন আলেমসমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে মুসলমানদের এই বিরাট উপকার লাভ হয় যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ফর্মুলায় পাকিস্তান গঠন হওয়ার পরও সাংবিধানিকভাবে হিন্দুস্তানে তাদের কোনো অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়নি। হ্যাঁ, কার্যত মুসলমানরা অনেক অন্যায় ও অন্যায্যতার শিকার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু এই যে মুসলমানরা নিতান্ত সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর করা অন্যায় ও অন্যায্যতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারছে, এর অধিকারটুকু সাংবিধানিকভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই সম্ভব হচ্ছে; যা ছিল আলেমদের একটি অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব।

দেশ ভাগের পর আলেমসমাজ হিন্দু-মুসলিম একদলীয় রাজনীতি ছেড়ে নিজেদের পার্লামেন্ট নির্বাচনের রাজনীতি থেকে পৃথক করে নেন। তবে পৃথকভাবে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখার দরজা তারা খোলা রাখেন; যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের একনায়কতন্ত্র এবং তাদের একচেটিয়া নীতির বিরুদ্ধে মুসলমানরা প্রয়োজনে সোচ্চার হতে পারে। আজাদি লাভের পরপর ১৯৪৭-এর নভেম্বরে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত বিশাল মুসলিম কনভেনশনে আলেমসমাজ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আজাদ হিন্দুস্তানে এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম ও সবচেয়ে বড় সম্মেলন, যেখানে মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে হিন্দুস্তানে বসবাসের অধিকার প্রদান করা হয়। উক্ত সম্মেলনে আলেমসমাজ মুসলমানদের পূর্ণ সাহসের সাথে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও জাতি গঠনে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন।

আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত আলেমসমাজ ও তাদের নেতৃত্বাধীন দল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সেই নীতি আদর্শের ওপর অবিচল রয়েছে, যা তারা ১৯৪৭ সালে আজাদি লাভের মুসলিম কনভেনশনে গ্রহণ করেছিলেন।

দেশ ভাগের পর অনেক বড় অনেক ঘটনা ও কঠিনসব মুহূর্ত আলেমসমাজ অসাধারণ নৈপুণ্য ও সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। ইসলাম ও

[১৬৮]. আল-জমিয়ত, জমিয়তে উলামা সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ১২০

মুসলমানদের প্রতি ক্ষোভ ও জিঘাংসাপরায়ণ শক্তি বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে আলেমসমাজকে দমানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা তাতে সফল হয়নি। হিন্দুস্তানের মুসলিম সম্প্রদায় যতদিন আলেমসমাজের নেতৃত্ব ও পরামর্শ মেনে কাজ করেছে, কোনোটিতেই তারা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু যখনই কোনো ইস্যুতে তারা আলেমদের ছেড়ে অন্য ঘরানার নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেছে, সেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও পরাজিত হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের ঘটনাসমূহ তারই প্রমাণ বহন করে।

বর্তমান পশ্চিম ইউপিতে মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য ও অগণিত মাদরাসা ও মসজিদ আবাদ হওয়ার পেছনে মূল নিয়ামক হচ্ছেন আকাবিরে সালাসা তথা তিন জন মহান পূর্বসূরি আলেম। তারা হলেন, শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ., আরেফবিল্লাহ আবদুল কাদের রায়পুরি রহ. ও শায়খুল হাদিস জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ.। তাদের ধৈর্য-স্থৈর্য ও দৃঢ়তা-অবিচলতার ফলে পশ্চিম ইউপি আজ মুসলমানদের বৃহৎ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

শায়খুল হাদিস জাকারিয়া রহ. তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আপবিতিতে লেখেন—

> হুসাইন আহমদ মাদানি ও আবদুল কাদের রায়পুরি রহ. সাহারানপুরে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর শরণাপন্ন হন। তারা পরামর্শ করেন, এই সময় পশ্চিম ইউপির হাজার হাজার মুসলমান সাহারানপুর ক্যাম্পে জড়ো হয়ে পাকিস্তান গমনের অপেক্ষা করছে। তাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মজলিসে আবদুল কাদির রায়পুরি রহ. এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে চলে যাওয়াই ভালো মনে করেন বলে মত ব্যক্ত করলেন। সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও তুলে ধরেন তিনি। কিন্তু হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. দুর্বার সাহসের সাথে বললেন, আমার স্বদেশ যদিও মদিনা মুনাওয়ারা এবং মাহমুদ (তার ছোট ভাই) আমাকে সেখানে ফিরে যেতে বারবার জোরাজুরি করছে, কিন্তু হিন্দুস্তানি মুসলমানদের এমন ভয়ানক হত্যা ও লুটতরাজ ঘেরা উপত্যকায় নিঃস্ব, অসহায় ফেলে রেখে কিছুতেই আমি যাব না। যারা নিজেদের জান-মাল, ইজ্জত আব্রু, দ্বীন ও দুনিয়া এখানকার মুসলমানদের জন্য উৎসর্গ করতে পারবে, তারাই এখানে থাকুক। আর যারা পারবে না তারা অবশ্যই চলে যাক।[১৬৯]
>
> শায়খুল ইসলাম মাদানি রহ.-এর এই বক্তব্য শুনে শায়খুল হাদিস জাকারিয়া ও আবদুল কাদের রায়পুরি রহ. উভয়ে হিন্দুস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
>
> এই তিন মহান ব্যক্তির হিন্দুস্তানে থেকে যাবেন শুনে হাজার হাজার মুসলমান পাকিস্তান গমনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসেন। আজ

[১৬৯]. আপবিতি : ৫/১৪২

পশ্চিম ইউপিতে ইসলামের যে রওনক ও সৌন্দর্য পস্ফুটিত হয়, তা এই তিন পূর্বসূরির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফসল।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের পূর্বসুরি আলেমদের যাবতীয় খেদমত ও আত্মত্যাগ কবুল করে নিন। দ্বীন ও দুনিয়া সকল বিষয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তাদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনের তাওফিক আমাদের দান করুন। আমিন।

স মা প্ত

গ্রন্থপঞ্জি

■ নকশে হায়াত, শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.

■ সফরনামা আসিরে মাল্টা, শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.

■ উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.

■ উলামায়ে হক আওর উনকা মুজাহিদানা কারনামে, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.

■ তাহরিকে শায়খুল হিন্দ, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.

■ আসিরানে মাল্টা, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.

■ মুসলিম উলামা কা কিরদার, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.

■ জমিয়তে উলামা কিয়া হে, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রহ.

■ সিরাতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ., মালানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি মিয়া নদবি রহ.

■ সারগুজাশত মুজাহিদিন, মাওলানা গোলাম রসুল মেহের,

■ মওজে কাওসার, শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম

■ তাহরিকে খেলাফত, কাজি আদিল আব্বাসি

■ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ.

■ সাওয়ানেহে মাওলানা দ্বীনপুরি রহ.

■ শায়খুল ইসলাম এক সিয়াসি মুতালাআ, ডক্টর আবু সালমান শাজাহানপুরি

■ তাহরিকাতে মিল্লি, ডক্টর আবু সালমান শাজাহানপুরি

■ রইসুল আহরার, মাওলানা আজিজুর রহমান লুধিয়ানুবি

■ মাওলানা আজাদ এক সিয়াসি ডায়েরি

■ মাকামে মাহমুদ, মাওলানা হাবিবুর রহমান কাসেমি

■ আপবিতি, শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া রহ.

■ তারিখে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, মাওলানা আসির আদরাবি

■ তাহরিকে আজাদি আওর মুসলমান, মাওলানা আসির আদরাবি

■ সিরাতে সুলতান টিপু শহিদ রহ., মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস নদবি

■ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ পর এক তারিখি তাবসিরাহ, মাওলানা হাফিজুর রহমান ওয়াসিফ

■ মুসলমান মুজাহিদিন

■ আর-রশিদ (পত্রিকা), দারুল উলুম সংখ্যা

■ আল-জমিয়ত (পত্রিকা), মুফতি আজম সংখ্যা

■ আল-জমিয়ত (পত্রিকা), মুজাহিদে মিল্লাত সংখ্যা

■ আল-জমিয়ত (পত্রিকা), জমিয়তে উলামা সংখ্যা

পাঠকের পাতা

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
ইসলামি আকিদা – ইলিয়াস ঘুম্মান
হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ
বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
হাজি শরিয়তুল্লাহ – আবদুন নুর সিরাজি
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি

প্রকাশিতব্য কিছু বই

তিতুমীর – মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম
ফকির মজনু শাহ ও ফকির আন্দোলন – এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সিরাজুদ্দৌলা – আমিরুল ইসলাম ফুআদ
তুঘলকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস – আমিন আশরাফ
খিলজি শাসনের ইতিহাস – হুসাইন আহমদ খান অনূদিত